বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের ষড়যন্ত্র
একটি প্রবন্ধগুচ্ছ
Jundullah
www.jundullahsite.wordpress.com

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের ষড়যন্ত্র

আরো অনেক.........

মহানবীর সা. সিরাত চর্চার অভাব : মিশনারীদের ভয়াল তৎপরতা

মহানবীর সা. সিরাত চর্চার অভাব : মিশনারীদের ভয়াল তৎপরতা

اقتباس:

শামসীর হারুনুর রশীদ :এক: এক অবিনাশী সামগ্রিক বিপ্লবের বাণী নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন হযরত রাসূল সা.। পূর্ণ সভ্যতা মানবতা ও শ্রেষ্ঠতর আদর্শের এই বিপ্লবি দাওয়াত কতদিন দিয়েছিলেন রাসূল সা.? খুব বেশী হলে- ৮১৫৬ দিন! এ স্বল্প সময়ে তার ডাকে সাড়াদিয়ে যে বিশাল অঞ্চল আদর্শের সবুজ-চিন্তায় প্লাবিত হয়ে উঠেছিল তা যদি আজকের জ্যামিতিক হিসেবে বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে রাসুল সা.এর দাওয়াতে প্রতিদিন ২৭২ বর্গমাইল অঞ্চল সাড়া দিয়েছিল। এই বিপ্লবের সবচে বিস্ময়কর বিষয় হলো, তাঁর মাধ্যমে অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আখলাক, রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক বিশাল বিপ্লব সাধিত হয়েছিল খুবই স্বল্প সময়ের পরিসরে। পৌত্তলিক সমাজব্যবস্থার বিপরীতে হয়ে গেলেন প্রিয় নবী সা. পৃথিবীর সকল শ্রেণী, সকল গোষ্ঠীর জন্যে অনুসরণীয় নমুনা।

ঈমানের আলোয় দিপ্ত এই কাফেলাকে নিবৃত্ত করতে আলোচনা, মতবিনিময়, সংলাপ, প্রলোভন, হুমকি ও অবরোধ আরোপের পথ ধরে মুশরিকসমাজ। কিন্তু ফলাফল অশ্ব ডিম্ব। শেষ পর্যন্ত আগ্রাসন। আগ্রাসন বলতে আমরা সাধারণত

সামরিক হস্তক্ষেপ ও সশস্ত্র আক্রমণকেই যে বুঝে থাকি তাতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবেও আগ্রাসন হতে পারে। এই আলোচনায় আসার আগে আমাদের জানা দরকার যে, দ্বীন-ধর্মের প্রচার-প্রসার প্রক্রিয়ায় মিথ্যাচার, কৃত্রিমতা, জোরজবরদস্তি, বহুরূপি-ছদ্মবেশী কার্যকলাপ পাপ বলে গণ্য। যে ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত নয়, সে ধর্ম পথ চলে কৃত্রিম উপায়ে। তার অন্ত:সার শূণ্যতাকে আবৃত করতে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ধারণ করে নানা ছদ্মবেশ।

বিশ্ব ব্যাপী খ্রিস্টধর্ম প্রচারে বহুরূপী এ হীন তৎপরতা দেখে সচেতন মানুষের একটাই প্রশ্ন; খ্রিস্টধর্ম সত্যিই যদি খোদার প্রদত্ত হয় তাহলে মিশনারীগণ ধর্ম প্রচারে ব্যাপক কৃত্রিমতা, শঠতা, জালিয়াতি, অপ-প্রচারসহ নানা প্রলোভনের আশ্রয় নেয় কেন?

দুই:
বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য তাদের সুদুর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা ও কুট-কৌশল বুঝার জন্য আমাদেরকে একটু পিছন নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ইসলামের বাইরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর দুটি ধর্মমত হলো-খৃষ্টধর্ম ও হিন্দু ধর্ম। অনুসারী সংখ্যার বিচারে বৌদ্ধ ধর্মকেও পৃথিবীর অন্যতম বড় ধর্ম বলতে হবে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, বৌদ্ধ ধর্ম তার প্রকৃতরূপ হারিয়ে ফেলেছে। এর আবির্ভাব হয়েছিলো হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সংশোধনের লক্ষ্যে। অথচ পরে হিন্দুবিশ্বাস ও আইডিয়ালোজি বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করে নিয়েছে। আসমানী ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদী ধর্মও একটি অন্যতম ধর্ম। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বয়ং ইহুদিদের মত হলো, এটা একটা বংশানুক্রমিক ধর্ম। এই ধর্ম কেবল হযরত ইসহাক আ. এর বংশধর সন্তানদের জন্যেই। তারা নিজেরাও তাদের ধর্মকে আন্তর্জাতিক ধর্ম মনে করে না। খৃষ্টধর্মের চেতনায়ও মূলত এই একই চিন্তার অনুরণন পওয়া যায়। তাদের চিন্তা দর্শন এ কথাই প্রমাণ করে এটা শুধু ইসরাইলীদের ধর্ম। ইঞ্জিলসমূহে হযরত ঈসা আ. কে এভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: হে রাব্বি। তুমি খুদার পুত্র। তুমি ইসরাইলের বাদশাহ (দ্র:ইউহান্না: ৪৯-৫০)। ইঞ্জিল মাত্তায় আছে: হে ইহুদীদের বাদশাহ। আদাব! (২৭-২৯) স্বয়ং হযরত ঈসা আ.ই বলেছেন: আমিতো কেবলমাত্র ইহুদীদের হারানো ভেড়ার সন্ধানেই প্রেরিত হয়েছি (দ্র: মাত্তা: ১৫:৪২) হযরত ঈসা আ. তাঁর বিশেষ সহচর বৃন্দ, কল্যাণকামী হাওয়ারীদেরকে বলেছেন: তোমরা ইহুদীদের বাইরে অন্য কারো কাছে যাবেনা, আর সামেরীদের অঞ্চলেও যাবেনা। (দ্র: মাত্তা: ১০:৫-৬)

আর এ কারণেই ইহুদীধর্মের পন্ডিতরা মনে করত, ইহুদীদের জন্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উঠাবসা-মেলামেশা নাজায়েজ, অবৈধ। (দ্র: আমাল : ১০-৮০)

এসব তথ্য থেকে একথাই প্রতিভাত হয়, খৃষ্টানদের জন্যেই ইহুদীসহ অন্যলোকদের মাঝে তাদের ধর্ম প্রচার ও তাবলীগের কোন সুযোগ নেই। স্বয়ং হযরত ঈসা আ. ই মনে করতেন: পরকালীন নাজাত ও মুক্তি রয়েছে কেবল ইহুদীদের জন্যে (দ্র: ইউহান্না: ৪: ২২)

ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ হলো বাইবেল, বাইবেলের দুটি অংশ রয়েছে৷ এটি ‘আহদে আতীক’ অপরটি হলো ‘আহদে জাদীদ’। আহদে আতীক বা বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বিখ্যাত দুই আসমানী কিতাব “তাওরাত ও যবুর”। তবে এগুলোর কোন বিশুদ্ধ সনদ সংরক্ষিত নেই৷ ইহুদী-খ্রিস্টানরা স্বীকার করেন এসব গ্রন্থ একাধিকবার বিলীন হয়ে হারিয়ে গেছে৷ তবে ‘বণী লাবীর’ র সহীফাটি তাবুত সাকীনায় সংরক্ষণ করেন৷ এটিই ছিলো তাওরাতের মূল কপি৷ কিন্তু ৭২১ খ্রিস্টাব্দে আশূরীয় বাদশাহ ‘সারগুণ’ ইহুদী রাষ্ট্রকে তছনছ করে ফেলে৷ এমনকি হাইকালে সুলাইমানী কে ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়৷ অত:পর তাবূতে সংরক্ষিত পবিত্র গ্রন্থকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলে৷ পরবর্তিতে বাদশাহ ‘বুখতে নসর’ এসে ইহুদী আবাসনের ধর্মীয় নিদর্শনাবলীর অবশিষ্ট যা ছিল তা মাটির সাথে গুড়িয়ে দেয়৷ ভস্মীভূত হওয়ার প্রায় ১৮১ বছর পর জনৈক গনক ‘আযরা’ নিজের স্মৃতির উপর বির্ভর করে পুনরায় তাওরাত গ্রন্থ সংকলন করেন৷ গ্রন্থটির বিশুদ্ধতায় স্বয়ং ইহুদী খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে কঠোর থেকে কঠোর৷ তাই এ বিরোধ পূর্ণ গ্রন্থটি ধর্মের পথ প্রদর্শক হতে পারে কি করে?

বাইবেলের ‘আহদে জাদীদ’ গ্রন্থটি আহদে আতীক অপেক্ষা আরো সন্দেহ পূর্ণ ও দ্বন্দ্বমুখর৷ কারণ হযরত ঈসা আ. সর্বদা নির্যাতিত ও পরাজিত জীবন-যাপন করেছেন৷ নবুওয়াত লাভের পর মাত্র তিন বছর পৃথীবিতে জীবিত ছিলেন৷ এই সল্প সময়ে মাত্র হাতে গোনা ক’জন৷ ঈমান এনেছিলেন৷ তার জীবনে ওহী লিপিবদ্ধ করার কোন উল্লেখ নেই৷ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বলে প্রচারিত ইঞ্জিলের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে৷ কিন্তু যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়াই কেবল চাঁরটিকেই মানা হয়৷ তা হলো (১) মাত্তা (২) মারকাস (৩) লোকা (৪) ইউহান্না৷ মাত্তা ও ইউহান্না দুজনই ঈসা আ. এর হাওয়ারী ও সঙ্গি ছিলেন৷ অথচ তাদের প্রতি সম্বোধিত এ দুই ইঞ্জিল তাদের মৃত্যুর পর তাদের শিষ্যরা সংকলন করেছেন৷

মারকাস হযরত ঈসা আ. এর শিষ্য পেট্রোস এর শিষ্য৷ ইঞ্জিল মারকাসটি যেন শিষ্যের শিষ্য এর হাতে-ঈসা আ. ৬৬ টি বছর পর সংকলিত হয়েছে৷ সেন্টপলের শিষ্য হলো লোকা৷ আর এই সেন্টপলকেই খ্রিস্টানধর্ম বিকৃত করার প্রধান আসামী রূপে গণ্য করা হয়৷ এই হলো সংকলন ও সংকলকদের করুণ ইতিবৃত্ত৷ তাছাড়া এই গ্রন্থ সমূহে এত বিপুল পরিমাণে বৈপরিত্ব বিদ্যমান যা সহজেই এর বিকৃত ও সংমিশ্রণকে প্রধান করে দেয়৷ অত:এব খ্রিষ্টানধর্ম কি করে সমগ্র মানবতার আদর্শ ও মডেল হতে পারে?

তিন:

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাগণ যখন যে দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের সাথে সেনাবাহিনী এবং মিশনারীকেও সাথে নিয়ে গেছে৷ সৈন্যরা অস্ত্রের জোরে জনগণকে বশে এনেছে আর মিশনারীগণ শিক্ষা, চিকিৎসা ও সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মন-মানসিকতাকে বদলে দিয়েছে৷

আমাদের ভূলে যাওয়ার কথা নয়, সময়টা ছিলো ১৫৩৬ সালের মে মাস। ইংরেজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঊঅঝঞ রহফরধ পড়সঢ়ধহু সম্রাট শাহজাহানের অনুমতিক্রমে এদেশে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তী আঠারো বছর অতি সন্তর্পণে কোম্পানি তাদের অবস্থান দৃঢ় করল। সে সাথে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো। ফলে ১৫৫১ সালে বাংলার সুবাদার শাহজাদা সুজা বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের এদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে দেন। শুরু হল তাদের অগ্রযাত্রা ও প্রসার। সেই সাথে বেড়েগেলো তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপট দৌরাত্ম। সরকারের প্রতি দেখাতে লাগল বেপরোয়া মনোভাব। জনগণের ওপর চালাতে লাগল জুলুম-নির্যাতন। অবস্থার আকস্মিকতায় তৎকালিন সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করেন ও তাদের দাপট দৌরাত্মা খর্ব করেন। ফলে ১৫৮৫ সালে প্রাদেশিক সরকারের সাথে বাধে সংঘর্ষ। অবস্থা বেগতিক দেখে সূচতুর ইংরেজরা প্রতারণামূলকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে আবার ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজরাও এই মোক্ষম সুযোগ কাজে লাগায়। এর ফলও পায় তারা।

১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়া পূর্বেকার সুযোগ-সুবিধার সাথে আরো কতিপয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। ইংরেজরাও তাদের ব্যবসা আরো সম্প্রসারণ করে। সাথে সাথে দেশের রাজনৈতিতে অহেতুক নাক গলাতেও শুরু করে। স্বার্থসিদ্ধির লক্ষে উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্থের বিনিময়ে একদল লোক নিজেদের দলে বিড়িয়ে ফেলে। বৈষয়িক লোভে অনেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বংশবদে পরিনত হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়। সেই ষড়যন্ত্রের সূত্র ধরেই ১৭৫৭ সালে সংঘটিত হয় পলাশির মহাবিপর্যয়। স্তিমিত হয় স্বাধীনতার সূর্য।

বণিকের বেশে আসা সেই ইংরেজরাই এদেশ শাসন করে, শোষন করে। এদেশের হাজার বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনষ্ট করে। মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে আলেম সমাজের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার। সে এক বেদনাধায়ক অধ্যায়। অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তপিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে উদিত হয় স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

চার:

একটি অপরাধী ইহুদি খ্রিস্টানের চেয়ে একটি নিরপরাধ নিরীহ মুসলিম সমাজের মূল্য এদের কাছে অনেক কম। মানুষ, মানবতা, আদর্শ ও নৈতিকতা এদের কাছে বড় বিষয় নয়। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দারা পোষন চতুস্পদের মতো হয়ে থাকোক, আর তারা হোক মোনিব। এই তাদের ইচ্ছা, তাদের মনোভাব, তাদের উচ্চাভিলাস। তাইতো মিথ্যা অজুহাতে ধ্বংস করে দিলো আফগানিস্থানকে, লন্ডভন্ড করে দিলো সহশ্রাব্দের ঐতিহ্যমন্ডিত ইরাককে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়ার বুকেও তাদের অবৈধ স্বার্থের ঘাটি স্বরুপ কয়েকটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যুগ যুগধরে কাজ করে আসছে। ফিলিপাইনে তারা সফল হয়েছে। লেবাননে খ্রিস্টান রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কয়েকটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তারা-১. আর্মেনিয়াকে দ্বিতীয় ইসরাঈল রূপে গড়ে তোলা। ২. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ

কসোবা, আলবেনিয়া পুরোপুরি খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসা। ৩. নাইজেরিয়া, ইথিউপিয়া ও ইরত্রিয়াকে খ্রিস্টান সংখ্যাগুরু দেশে পরিণত করা। ৪. ভারতের দুই কোটি ৪০ লাখ খ্রিস্টানের জন্য দেশটির উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রদেশ ও ঝাড়খন্ড নিয়ে এক বা একাদিক খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান করা। ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করে বিশেষ আশ্রিত রাজ্যে রূপান্তরিত করা। কৌশলে বাংলাদেশকে খ্রিস্টান রাজ্যে পরিণত করা। কারণ পাকিস্তান, ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, গোটা ইন্দোচীনের ওপর নজরদারি করতে বাংলাদেশকে খ্রিস্টান রাজ্য করার বিকল্প নেই। এ কারণেই সম্ভবত প্রয়াত খ্রিস্টান ধর্মজাযক ‘‘মাদার তেরেসা’’ ঘোষণা করেছিলেন, ৫০ বছরের ভেতর বাংলাদেশ হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান রাজ্য।

১৯৯৩ ঈসায়ী ৭ই নভেম্বর খ্রিস্টানবিশ্বের ভ্যাটিকান পোপজনপোল এসেছিলেন ভারতের দিল্লীস্থ নেহেরু স্টেডিয়ামে ভক্তদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। তিনি স্বগর্বে উচ্চারণ করেছিলেন ‘‘এশিয়ায় চার্চনীতির ভবিষ্যত ধর্মান্তর।’’

উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম একটি দেশ সুদানের কথা বলা যেতে পারে। দারিদ্রতার সুযোগে অসংখ্য মসুলমানকে তারা ধর্মান্তরিত করেছে। দেশটিতে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ৯ জুলাই ২০১১ সালে সুদান থেকে পৃথক করে ‘‘দক্ষিণ সুদান’’ সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টান দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। সুদানের রাজধানী ‘খার্তুমে’ মসজিদের চেয়ে গীর্জার সংখ্যা বেশী। এছাড়াও গোটা আফ্রিকা মহাদেশের ২৭ কোটি ৭০লাখ মুসলমান আজ মিশনারীদের টার্গেট। হায় আফসোস!

পাঁচ:

১৫৩৬ সালে মে মাসে বণিকের বেশে আসা সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টানরা চলেগেলেও তাদের ষড়যন্ত্র বন্দ হয়নি। রূপ বদলে গেছে, কৌশলে পরিবর্তন এসেছে মাত্র। ৭০ এর জলোচ্ছাস, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, ৮৮ সালের বন্যা পরবর্তী সময় দফায় দফায় এদেশে এন.জি.ও দের পুর্ণ: পদচারণা শুরু হয়। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্টির অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে, রং বদলানো গিরগিটের মত সেবার ছন্দাবরনে আবার এদেশে ঘাঁটি গেড়েছে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারে মিশনারিরা ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গুপালের মতো ঝাপিয়ে পড়েছে। গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন এন.জি.ও। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ত্রিশ সহস্রাধিক এন.জি.ও রয়েছে। এর মানে এ দেশের প্রতি বর্গ মাইলে ৩.৫ বা ততোধিক এন.জি.ও তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। তখনকার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বর্তমান এন জি ওর মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই যে, তারা এসেছিল বণিকের বেশে, এরা এসেছে সেবকের বেশে।

৭১ সালে দেশ স্বাধিন হবার পর অস্ট্রেলিয়ার ব্যপটিষ্ট মিশনের এক পরিকল্পনায় বলা হয়, একটি নতুন জাতির জন্ম হয়েছে। নাম বাংলাদেশ। এদেশের মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের অপূর্ব সুযোগ আছে। কারণ-

(১) ইসলাম আর এখন এদেশের রাষ্ট্রিয় ধর্ম নয়।

(২) ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রযুক্তির সুবাদে তরুণ ও ছাত্র সমাজের অনীহা সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করেছে।

(৪) পশ্চিম পকিস্তানীগণ তাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের ঈমান নিয়ে ঠাট্রা বিদ্রুপ করেছে।

(৫) আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু নতুন দম্পতিদেরকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে বাংলাদেশে প্রেরণ করবেন।

(৬) এসব দম্পতি পরিকল্পনা করে এমন লোকদের খ্রিস্টান করবে যারা ভবিষ্যতে নিজেরাই অন্যদেরকে খ্রিস্টান করতে পারবে।

(৭) অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশন এ দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে।

(৮) বাংলাদেশে খ্রিস্টান ধর্মের ভাবমূর্তি খুবই উজ্জল।

এন.জি.ও ব্যুরোর বির্পোট অনুযায়ী শতকরা ৫২% এন. জি. ও সরাসরি খ্রিষ্টধর্মের প্রচারে লিপ্ত। বিদেশি দাতা সংস্থা গুলোর শিংহভাগ অর্থ খ্রিস্টধর্মের প্রচার প্রসারে, নবদিক্ষীত খ্রিস্টানদের পুনর্বাসন, সুযোগ সুবিধা, খ্রিস্টানধর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কেন্দ্র, চার্চ, স্কুল, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও উন্নয়ন সাধনে ব্যায় হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১৯৩৯ সালে যেখানে বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিলো পঞ্চাশ হাজার সেখানে ১৯৯২ সালে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠির সংখ্যা দাড়িয়েছে পঞ্চাশ লাখে। ধারণা করা হচ্ছে ২০১৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে সোয়া এক কোটিতে। ১৯৯১ সালে শুধু মাত্র ''গাড়ো পাহাড়ে'' ষোল হাজার খ্রিস্টান ভোটার তালিকাভূক্ত হয় এবং মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ৫০ হাজার।

ছয়:

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচার তৎপরতা:

বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য 'হ্যাগাই ইন্সটিটিউট' ২০০০ সালের মধ্যে দশ লক্ষ ধর্ম প্রচারককে ধর্ম প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল। আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান মিশনারী গবেষণা বুলেটিন হতে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯১ সনে বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে এক লক্ষ বিশ হাজার আটশত আশি (১,২০.৮৮০) টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৬ই এপ্রিল ১৯৯৮ সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট হতে জানা যায়, ১৮৯০ সাল হতে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ৬০,০০০ বই, সিডি, ওডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মুখপাত্র 'আলোর ফোয়ারা' এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের 'স্বর্গমর্ত' ম্যাগাজিন উল্লেখযোগ্য।

মিশনারীগণ ধর্মান্তরিত করতে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে। তাদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে 'বাইবেল' নামেই বহুল

পরিচিত। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নামের পরিবর্তনে কিংবা গিরগিটের মত রং রূপের বৈচিত্রে খ্রিস্টানদের জুড়ি নেই। ১৯৩৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বাইবেলকে 'ধর্ম পুস্তক' বাংলাদেশে এ গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে 'পবিত্র বাইবেল' এবং বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে তারা 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' নামে বিতরণ করছে। আবার কোথাও সরাসরি 'ইঞ্জিল শরীফ' নামের লেভেল সেঁট দিচ্ছে।

চতুর খ্রিস্টানরা তাদের ''কিতাবুল মোকাদ্দাস ও ইঞ্জিল শরীফ'' এর প্রচ্ছদ সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যবাহী নকশা দ্বারা অলংকৃত করে প্রকাশ করে। বিভিন্ন রংয়ের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রংয়ের ইসলামী নকশা দেখে এটাকে পবিত্র কোরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদীস গ্রন্থ বলে ভূল করা স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় বর্তমানে তারা তাদের যাবতীয় ধর্মীয় পুস্তক ও প্রচার পত্রাদির প্রচ্ছদ মসজিদ, কালেমা, আরবী বর্ণের শৈল্পিক নকশার দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করেছে। ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামসমূহ চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। যেমন আদিপুস্তক (আল-তৌরাত, প্রথম সিপারা, পয়দায়েশ, গীত সংহতি (আল-জাবুর), পরমগীত (নবীদের কিতাব, সোলায়মান) ইশ্বর (আল্লাহ) ইশ্বপুত্র (ইবনুল্লাহ), ভাববাদী (নবী), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহম (ইব্রাহিম) ইত্যাদি।

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ করে বানোয়াট, অপ ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করছে। যেমন- আর কোরআনের আলো, সিবগাতুল্লাহ সহায়ক, তরীকা হক্ক, বাণী বাহক, ইসা আ. কে কেন আল্লাহর পুত্র বলা হয়, আসমানী কিতাব শিক্ষা, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি, ত্রিত্বপাকের মাঝে আল্লাহ এক, করআন ও বাইবেলের সমন্বয়, ইঞ্জিল ও কোরআনে ঈসা আ. ইত্যাদি।

খ্রিস্টানরা গোপনে ছদ্মবেশী ইমাম, আলেম, হাদীস পারদর্শী করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ করা, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করা, মুসলমানদের মাঝে আত্মকলহ বাধিঁয়ে দেয়া। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা এখন দেদারছে ইসলামী কায়দায় নামও রাখতে শুরু করেছে। যেমন- আব্দুল ওযাহাব, আব্দুল মাবূদ, সুলতান মুহাম্মদ পৌল, ইসকান্দার জাদীদ, সেলিম আহমদ ইত্যাদি। তারা নিজেদের খ্রিস্টান পরিচয় না দিয়ে বলে আমরা ''ঈসায়ী মুসলমান'' তারা কালিমা, দূরুদ সবই বানিয়ে ফেলছে- ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া ঈসা সালাম আলাইকা।

সিলেটের উপশহরে ঈসায়ী জামাত কর্তৃক পরিবেশিত সিলেটি ভাষায় পবিত্র ইঞ্জিল শরীফ বা বাইবেল শরীফ ও কুরআনের আলোকে বেহেস্তে যাওয়ার পথ বইগুলো খুবই বিভ্রান্তি কর।

সাত:

অর্থনৈতিক মুক্তির নামে গ্রামের মুর্খ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চড়া সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে থাকে। এর চক্র বৃদ্ধি সুদ পেয়ে এদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছে। অন্যদিকে গরিব অসহায় ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে নিজের বস্তু ভিটা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এ দিকে এন.জি.ও গুলো কিস্তি পরিশোধে দেরি হওয়ার **"**অপরাধে**"** গরিব কৃষকের হালচাষের গরু নিয়ে যাচ্ছে। ঘর থেকে হাড়ি-পাতিল নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি নববধুর নাকের নথ খুলে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করছেনা। তবুও তারা সেবক, মানবাতবাদী!

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বন্ধুর লেবাসে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান পরিচালিত এন.জি.ও সংখ্যা ৩০ হাজারেরও অধিক। মানে? এ দেশের প্রতি বর্গ মাইলে ৩.৫ বা ততোধিক এন.জি.ও তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টান সংস্থা যারা সরাসরি ধর্মান্তরের কাজে লিপ্ত তাদের সংক্ষিপ্ত ফিহরিস্ত নিম্নে প্রদত্ত্ব হলো-

১. ব্যাপটিস্ট মিশন ২. খ্রিস্টান রিফার্মড ওয়ার্ল্ড রিলিপ কমিটি ৩. সেভ দ্যা চিল্ড্রেন ফান্ড ৪. দ্যা সেলভেশন আর্মি ৫. ডেভিট লিভিং স্টোন মিশনারী ফাউন্ডেশন ৬. ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি বাংলাদেশ। ৭. ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ। ৮. ক্রিশ্চিয়ান হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট। ৯. সেভেনথ ডে এডভেন্টিস্ট ১০. চার্চ অব বাংলাদেশ। ১১. সুইডিশ ফ্রি চার্ব এইড। ১২. নিউজিল্যান্ড ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি। ১৩. ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশণ অব বাংলাদেশ ১৪. ডেনিস বাংলাদেশ লেপারসি মিশন। ১৫. বাংলাদেশ লুথরান মিশন। ১৬. ক্রিশ্চিয়ান ন্যাশনাল এনজিলিজম কমিশন। ১৭. এসেম্বলিজ অব গড় মিশন। ১৮. কলেজ অব ক্রিশ্চিয়ান থিউলিজি ১৯. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ২০. দি অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি। ২১. চার্চ অব গড় মিশণ। ২২. চার্চ বাংলাদেশ কারিতাস। ২৩. ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি। ২৪. ক্রিশ্চিয়ান অর্গানাজেশন কর রিলিফ, কাকরাইল। ২৫. এম.সি.সি। ২৬. দীপশিখা। ২৭. আর.ডি.আর.এস। ২৮. খ্রিস্টান কমিশন ফর ডেভেলাপমেন্ট ইন বাংলাদেশ। ২৯. হিড বাংলাদেশ ইত্যাদি।

আট:

সেনা সদরের হুশিয়ারী: কান্ডারী কোন পথে?

"সেনা সদরের সতর্ক বাণী: পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন পূর্ব তিমূর না হয়**"**

(দৈনিক আমার দেশ ১০ এপ্রিল ২০১১ ঈসায়ী)

এম.এ. নোমান তার সন্ধানী রিপোর্ট লিখেন: পার্বত্য চট্টগ্রাম যাতে পূর্ব তিমূর ও দক্ষিণ সুদানের মতো কোন ধরণের অনাকাংখিত ঘটনা না ঘটে সেজন্য সরকারের উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেনা সদর দফতর। সেনা সদর দফতর থেকে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও সন্ত্রাসী গ্র**"**পগুলো অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করছে। মিয়ানমার ও ভারতীয় কয়েকটি গ্র**"**পের কাছ থেকে পার্বত্যাঞ্চলে অস্ত্র আসছে। সম্প্রতি পূর্ব তিমূর ও দক্ষিণ সুদানের রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেখানে এর সূচনা হয়েছিল প্রায় ৭৫-৮০ বছর আগে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব তিমূরের মতো কোন অনাকাংখিত ঘটনা না ঘটে, তা এখন থেকেই সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

সেনা সদর দফতরের বক্তব্যের বিষয়ে বৈঠকে উপস্থিত তখনকার তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আযাদ বলেন, বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা ঘন ঘন পার্বত্য চট্টগ্রামে সফর করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদেশী সাংবাদিক ও বিভিন্ন লোকের আনাগোনও বেড়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে বিদেশীদের নিশ্চয় কোন গোপন এজেন্ডা রয়েছে। (আমার দেশ,১০এপ্রিল ২০১১ ঈসায়ী) শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামই না, পুরো বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চল বিশেষ: উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র ক্লিষ্ট সাধাসিধে মুসলমান, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন উপজাতি এলাকায় খ্রিস্টানদের জয়জয়াকার। বাগানী, খাশিয়া, মনীপুরীসহ বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসীরা ইতিমধ্যে ৯৫ শতাংশই খ্রিস্টান ধর্মী হয়ে গেছে। এদিকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অভিজাত পাড়ায় এলিট শ্রেণীর এক বিরাট জনগোষ্ঠি সুযোগ-সুবিধার লালসায় ধর্মান্তরিত হচ্ছে। ঈষান কোণে কালো মেঘের আনাগোনা বেড়ে গেছে। এনজিওরা যেভাবে এগুচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে, এদেশের বুক চিরে আরেকটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব তিমূরের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস আমাদেরকে তা-ই বলে। কিন্তু হায়! কান্ডারী কোন পথে.......?

যেখানে দেশের সচেতন জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আশঙ্কার শেষ নেই। সেখানে আমাদের কান্ডারী সরকার ও তার আমলা-কামলারা সন্তুলারমাদের সাথে চুক্তি করে, শান্তিতে নোবেল পুরুষ্কারের আসা করা বড় দু:খজনক! এদশের চিহ্নিত কিছু রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের নাম করা কথিত প্রতিনিধিরা সরকারের গাড়ে ছওয়ার হয়ে পরামর্শ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা কেম্প উঠিয়ে দেয়াটাও দু:খজনক ও বুকামীই বটে।

পার্বত্য চট্রগ্রামে এন জি ও রা এত দূর থেকে এসেও যদি খ্রিষ্টধর্ম ও তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার প্রচার করতে পারে তাহলে আমরা কেন পারলাম না?
জেগে উঠার সময়কি আমাদের আসেনি? আমরা কেন হাত গুটিয়ে বসে থাকলাম? আমরাও তো পারতাম পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। মিশনারি এনজিওরা সদা সতর্ক ও জাগ্রত আর আমরা অসর্তক ও ঘুমন্ত। এভাবেই পলাশি এসেছিলো। চারীদিকে মীরজাফরেরও অভাব নেই। ইতিমধ্যে এনজিওদের পদলেহী একটি গ্র"পও তৈরী হয়েগেছে। তাদের প্রতিরোধে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলা খুবই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে (ক) বিজ্ঞ আলেম-ওলামা ধর্ম ও দেশ প্রেমী সমাজ বিশেষজ্ঞজনদের নিয়ে র্বোড গঠন করে সমন্বিত ভাবে কর্ম পন্থা ঠিক করতে হবে। (খ) সমাজের জনসাধারকে এনজিওদের দেশ, ধর্ম ও জাতি বিরোধী কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। (গ) দেশ ও ধর্ম বিরোধী এনজিওগুলোকে চিহ্নিত করে এদের প্রতিরোধে গন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। (ঘ) দেশের দারিদ্র পীড়িত অঞ্চল সমূহে সুদমুক্ত ঋণ দান কর্মসূচি পালন করতে হবে। প্রয়োজনে ধনাট্যদের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। (ঙ) দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ সরবরাহসহ জনকল্যাণ মুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

তা হলেই আশা করা যায় সারা দেশে ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা দেশ, ধর্ম ও মানবতা বিরোধী এনজিওদের হাত থেকে জাতি, ধর্ম সর্বপরি এদেশের স্বধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসুত্র

বাংলাদেশ- এনজিওদের দূর্ভোদ্যজালে/ দুনিয়া ঈসাইয়্যাতা কী যদমে (উর্দু)/ এদ্বারা স্মারক ২০১২ইং/ এনজিওদের ষঢ়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ/ ডক্টর ইউনুসের দারিদ্র বাণিজ্য/ বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ সা:/ টাইম ম্যাগাজিন ১৯৯৮ইং/ দৈনিক আমারদেশ ১০ এপ্রিল ১১ইং।

প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র

ইসলাম ও আমরা

নিকলসন তাঁর গ্রন্থের ১৪৯ নম্বর পৃষ্ঠায় তাসাওফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, প্রকৃত অর্থে সুফি সেই ব্যক্তি, যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব থাকে না; বরং সে খোদার মাঝে জীবিত থাকে। এখানে ধ্বংস হওয়াটা প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। সারাংশ হলো, একজন মুসলিম সুফির শেষ পরিণাম হচ্ছে খোদা হয়ে যাওয়া ও খোদার সঙ্গে প্রভুত্বে অংশীদার হয়ে যাওয়া। (নাউজুবিল্লাহ) সাধারণ মানুষ তো তাদের ষড়যন্ত্রের জালে খুব

দ্রুতই আটকা পড়বে। বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটি, স্কুল-কলেজ অথবা পশ্চিমা বিশ্বে শিক্ষার্জনে রত, তরুণ সমাজ তারা প্রাচ্যবিদদের জালে ফেঁসে যায় খুব দ্রুত।

মূলত প্রাচ্যবিদদের আন্দোলনের সূচনা হয় ১৩ শতাব্দীর সেই সময়, যখন খ্রিস্টীয় জগৎ ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রুশযুদ্ধে বারবার পরাজয়ের গ্লানি বহন করছিল। তখন তাদের দার্শনিক ও গবেষকরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, বর্তমানে শক্তি-সামর্থ্য ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে ইসলামকে আদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এরপর তারা যথেষ্ট গবেষণা ও দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর এই কর্মপন্থা নির্ধারণ করল যে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বীয় আক্রমণাত্মক ভূমিকা এবং যুদ্ধপলিসি পরিত্যাগ করে অথবা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি-দর্শনের মোড়কে ইসলামী দর্শনকে অসার, অবাস্তব প্রমাণ করতে হবে এবং অসির পরিবর্তে মসির মাধ্যমে মুসলমানদের কোণঠাসা করতে হবে।

এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পশ্চিমা গবেষকরা নিজেদের স্বভাবজাত শঠতা ও ধূর্ততার মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। তারা ইহুদি ধর্মযাজক ও খ্রিস্টান মিশনারিদের এ কথার ওপর উদ্বুদ্ধ করল যে ইউরোপে ইসলামী শিক্ষার কথিত নেতিবাচক(?) দিকগুলোর ওপর গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক এবং সেখানে রিসার্চ স্কলার্সের নামে ধীমান খ্রিস্টান গবেষক ও ইহুদি ধর্মযাজকদের নিয়োগ দেওয়া হোক। তাদের কাজ হবে ইসলামের মৌলিক উৎস তথা কোরআন, হাদিস ও অন্যান্য ইসলামী তত্ত্ব-উপাত্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর ইসলামী শিক্ষার আসল আকৃতিকেই বিকৃত করে বিশ্ববাসীর সামনে নতুন গবেষণার মোড়কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করা। তারা সেখানে এমন কিছু মনগড়া যুক্তি-প্রমাণও পেশ করবে, যার মাধ্যমে ইহুদি ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্রিস্টান ধর্মের

সত্যতা আপনা-আপনিই প্রতিভাসিত হয়ে ওঠবে। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে সংকীর্ণতায় ভুগবে এবং নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করবে। প্রফেসর অ্যারন্যান্ডের রচিত 'প্রিচিং অব ইসলাম' উল্লিখিত বক্তব্যের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন ধরে প্রাচ্যবিদরা কোরআন হাদিস, সিরাতুন্নবী (সা.) ইসলামী আইনশাস্ত্র, ইসলামের চরিত্র অধ্যায় ও তাসাওফের (তথা ইহসান) অধ্যয়ন এ উদ্দেশেই করে আসছে, যেন সেখান থেকে তাদের কথিত ভুলত্রুটি বের করে ইসলামকে কলঙ্কিত করতে পারে। তাদের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে, সর্বপ্রথম তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মতবাদ তৈরি করে নেয়। এরপর ওই মতবাদটি প্রমাণ করতে তাওয়ারিখ, হাদিস, সিরাত ও ইসলামী ফিকহের অগ্রহণযোগ্য এবং অসমর্থিত যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে। সে উদ্দেশ্য সাধনে তারা মিথ্যার পসরা সাজাতে কিংবা শঠতার আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

যে মতটি তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে, তা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যতই দুর্বল কিংবা সন্দেহযুক্ত হোক না কেন, সেটিকে তারা নির্লজ্জতার চরম সীমা অতিক্রম করে এবং চরম প্রবলতার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য ও সমর্থিত বলে চালিয়ে দেয়। কোরআন, হাদিস, তাফসির শাস্ত্র, ফিকাহ শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র, সাহাবাচরিত, তাবেইন, মুজতাহেদিন, জরহ-তাদিল শাস্ত্র, কোরআন ও হাদিস সংকলন, হাদিসের প্রামাণ্যতা ও সুলুকে তরিকতের বড় বড় শায়খ, মোটকথা ইসলামের প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের ওপর প্রাচ্যবিদদের বিশাল বিশাল রচনাসম্ভার ও তাদের স্বঘোষিত গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধে এত বেশি তথ্য-উপাত্তের সমাহার ঘটেছে, যা একজন সচেতন মুসলমানের অন্তরেও বিভ্রান্তি এবং পূর্ববর্তী ওলামা মাশায়েখ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টিতে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। সাধারণ মানুষ তো তাদের ষড়যন্ত্রের জালে খুব দ্রুতই আটকা পড়বে। বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটি, স্কুল-কলেজ অথবা পশ্চিমা বিশ্বে শিক্ষার্জনে রত, তরুণ সমাজ তারা প্রাচ্যবিদদের জালে ফেঁসে যায় খুব দ্রুত।

পশ্চিমা গবেষকরা, যাদের অধিকাংশই 'ইহুদিবাদের প্রবক্তা' তারা তাসাওফ যা মূলত শরিয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ইহসানেরই সমার্থক- এর ওপর গবেষণা এবং অনুসন্ধানের নামে দোষ-ত্রুটি খুঁজতে যে অপরিসীম চেষ্টা ও অবিরত সাধনা করেছে, তা তাদের তাসাওফের ওপর রচিত গ্রন্থসম্ভার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ইউরোপে তাসাওফের পুরনো, মৌলিক গ্রন্থাবলির প্রচার প্রসার ও এর প্রকাশনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে এই কাজগুলো তারা ইসলামের সেবা করার মনমানসিকতা নিয়ে করেনি; বরং তাদের সব প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাসাওফের ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী শিক্ষায় অনুপ্রবেশ ও তাসাওফের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্রুশযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। তাসাওফের প্রাচীন এবং দুর্লভ গ্রন্থগুলোর পাণ্ডুলিপি খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে তার প্রচার-প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যা হয়তো প্রাচ্যবিদদের হাতেই প্রণীত অথবা তাসাওফের কিছু প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ, যা তাদের সম্পাদনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায়, যা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার কিছু গ্রন্থ জার্মান ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার অন্যতম মাধ্যম ইহসান যা পরবর্তী যুগে তাসাওফ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এর প্রচার-প্রসারে তাদের সব সাধনা যে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা এবং ইসলামের সেবার মানসিকতা নিয়ে করছে না, তা হলফ করেই বলা যায়। দুর্লভ গ্রন্থগুলোর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা ছাপানো, প্রচার করা-এ সবই হচ্ছে তাদের ষড়যন্ত্রের অংশ। এ কথা তো প্রত্যেক সচেতন ও শিক্ষিত লোক জানে যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো, তাদের কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস চালানো, অসত্য এবং অবাস্তব বর্ণনা তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা- এসব ইহুদিদের স্বভাবজাত চরিত্র। যারা পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় ইসরায়েলি মনগড়া বর্ণনার একটি বড় অংশ অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে এবং যারা ইসলামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জামায়াত সাহাবায়ে কেরামের উন্নত চরিত্র ও অবিস্মরণীয় কীর্তিকে বিকৃত করে ইতিহাসের মোড়কে মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, তাদের কাছে এই আশা করা যে তারা তাসাওফের মতো একটি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তার বাস্তব ও অবিকৃত আকৃতিতে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করবে এটা স্রেফ বোকামি ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যারা এসব ধারণা লালন করে, তারা মূলত বোকার স্বর্গেই বাস করে। তাসাওফের মতো ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থাবলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যথা- আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ড থেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের একটি লক্ষ্য এটাও ছিল যে ইহুদি-খ্রিস্টানরা ক্রুশযুদ্ধে রণাঙ্গনে যখন বারবার পরাজয়ের গ্লানি বহন করছিল, তখন তারা প্রতিশোধের নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন স্থানে ইসলামী গবেষণার নামে বিভিন্ন নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে বসে। সেখানে প্রাচ্যবিদ ও ছাত্ররা ইসলামের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার হীনস্বার্থে নিজেদের মনগড়া এমন কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইসলামী গবেষণার মোড়কে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, যা পড়লে সাধারণ মানুষ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। এভাবেই প্রাচ্যবিদরা ইসলাম ও মুসলমানদের কুৎসা রটানো ও ইসলামের সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

প্রাচ্যবিদরা ইসলামের মূল রূপকে বিকৃতি ও কলঙ্কিত করতে কোন ধরনের হাতুড়ি ব্যবহার করেছেন, তা তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ তাসাওফের অন্যতম পুরোধা শাইখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবি (রহ.) ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রাচ্যবিদরা, তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ পশ্চিমা গবেষক নিকলসন স্বীয় গ্রন্থে ঝঃঁফরবং রহ রংষধসরপ (ইসলামী তাসাওফের পর্যালোচনা) ইরানের সুফি আব্দুল করিমের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আরবির দর্শনে যে সংযোজন করে তার উদ্দেশ্যও শুধু এই যে তাসাওফের এই কন্টকাকীর্ণ রাজপথে উম্মতকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে ফেলে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করা এবং তাসাওফকে বিকৃত করে মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করা। যাতে মানুষ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। নিকলসন তাঁর গ্রন্থের ১৪৯ নম্বর পৃষ্ঠায় তাসাওফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, প্রকৃত অর্থে সুফি সেই ব্যক্তি, যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব থাকে না; বরং সে খোদার মাঝে জীবিত থাকে। এখানে ধ্বংস হওয়াটা প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। সারাংশ হলো, একজন মুসলিম সুফির শেষ পরিণাম হচ্ছে খোদা হয়ে যাওয়া ও খোদার সঙ্গে প্রভুত্বে অংশীদার হয়ে যাওয়া। (নাউজুবিল্লাহ)

অথচ বাস্তবে ইসলামী তাসাওফের মৌলিক উদ্দেশ্য স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির একীভূত হওয়া কিংবা তার প্রভুত্বে অংশীদার হওয়া নয়। তদ্রূপ প্রভুর সঙ্গে তার জাত ও গুণাগুণে অংশীদারিত্ব, এটিও তাসাওফের লক্ষ্য নয়। অথচ ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের সহজ ও সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, হজরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানি (রহ.)-এর ভাষায় ধ্বংস ও অস্তিত্বের ধ্যান করার অর্থ প্রভুত্বে অংশীদারিত্ব নয়। কেননা, একজন সুফি মুরাকাবার (ধ্যান) সময় নিজেকে স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত বলে ধারণা করে। তার এই অবস্থা মানুষের হুবহু স্বপ্নের মতোই। অর্থাৎ এগুলো কিছুই বাস্তব নয়, বরং কল্পনামাত্র। যেমন ধরুন, আপনি স্বপ্ন দেখলেন, আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। এখন আপনিই বলুন, সত্যি সত্যি কি আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন? কখনো নয়। তদ্রূপ একজন সুফি যখন মুরাকাবার সময় নিজেকে খোদার সঙ্গে একীভূত দেখে, তখন সে বাস্তব অর্থে খোদা হয়ে যায় না। বরং তা তার কল্পনা থেকে বেশি কিছু নয়। (মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী খ. ১, ম. ২৬৬, পৃ. ৫৮৯)

তাসাওফের এই পরিভাষাকে হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন- তাঁর ভাষায়, সুফি আল্লাহর প্রেম এবং মহব্বতে সর্বদা নিমগ্ন ও নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে তার ধারণা অনুযায়ী সে আল্লাহর অস্তিত্বে এভাবে একীভূত হয়ে যায়, যেমন লোহার টুকরো আগুনে পুড়ে আগুনের মতো লাল ও প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়। মনে হয় যেন লোহার টুকরোটিও আগুনে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবে লোহাটি কিন্তু আগুন হয়নি। বরং তা আগের মতো লোহাই আছে। ঠিক অনুরূপ সুফিও আল্লাহর প্রেমের আগুনে জ্বলে থাকে। অথচ তা কিন্তু লোহার মতোই। যা হোক, এসব কিছুই হচ্ছে কাল্পনিক ছায়ামূর্তির মতো কিছু দর্শন, বাস্তবতার সঙ্গে যার দূরবর্তী সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। (হামআত পৃ. ৩৬)

সার কথা হলো, প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব পন্থায় ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে গবেষণার নামে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো অন্যতম। এটি কখনো মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনধারার পাথেয় ফিকাহ শাস্ত্রের ব্যাপারে কুৎসা রটিয়ে, কখনো মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনযাপনের অবিচল ও নিপুণ পন্থা তাকলিদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে, কখনো ইসলামের দেওয়া মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের শাশ্বত বিধান এহসান তথা তাসাওফকে বিকৃত করে সেখানে কবর পূজা, মাজার পূজা, ফকির পূজা, গান-বাদ্য-বাজনা, বেপর্দা-বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মুসলমানদের ইমান আমল ধ্বংসের পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা এ কাজ নামধারী কিছু মুসলমান তথাকথিত গবেষকদের দ্বারাও করিয়ে নিচ্ছে সুকৌশলে।

হঠাৎ করে কোনো গবেষককে আবির্ভূত হতে দেখা যায় ও গবেষণার ফল বের হয় মানবতার হেদায়াতের মূর্তপ্রতীক সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে ভরপুর। কোনো কোনো গবেষকের গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়, পবিত্র হাদিসকে সহিহ-জয়ীফ বলে রাসুল (সা.)-এর হাদিস সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে। এভাবে নিকট-অতীত থেকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ধর্মীয় আকিদাসংক্রান্ত ফাটল তৈরি, বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, এমন যত নতুন থিউরি গবেষণার নামে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তার অধিকাংশেরই যোগসূত্র ওইসব ইসলামের দুশমন প্রাচ্যবিদদের সঙ্গে গ্রথিত। তাই ধর্মীয় বিষয়ে হঠাৎ কোনো গবেষক স্কলারের আবির্ভাব হলে প্রথমে তার গবেষণাকে ইসলামের সুস্পষ্ট চারটি দলিল, যথা কোরআন, সুন্নাহ,

ইজমা ও কিয়াসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে। যাচাই-বাছাই না করে যেকোনো ধরনের গবেষণার পেছনে ছুটলে পদচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

মুফতি শাহেদ রহমানী

লেখক : সিইও, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

বাংলাদেশে ধর্মান্তরের অপতৎপরতা : ওলামায়ে কেরাম ও সুধীজনদের করণীয়

Yusuf Islam

এই প্রবন্ধে ধর্মান্তরের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মাধ্যম ও মোকাবিলার উপায় আলোচনা করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

এক. খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর কী?

সংজ্ঞা : ধর্মান্তর শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ধর্ম পরিবর্তন করানো। পরিভাষায় আমরা বুঝি, মানুষকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। যদি তারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে অন্তত স্ব ধর্ম থেকে বের হওয়ায় উৎসাহিত করা। বিশেষ করে মুসলিমদের ক্ষেত্রে এমনটি করা।

খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন, যা ক্রুসেড যুদ্ধের প্রসারে প্রসার লাভ করেছে। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-বর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা, বিশেষ করে মুসলিমদের মাঝে। [৬]

কুরআনিক ইতিহাস :

খ্রিষ্টধর্মানুসারীরা যখন থেকে তাদের পতন বুঝতে পেরেছে, তখন থেকেই তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসারে বিশেষ করে মুসলিমদের ধর্মান্তর করে খ্রীস্টান বানানোর চেষ্টা শুরু করেছে। [৭] এজন্য তারা মুসলিমদের বন্ধু হয়েছে, ভাই সেজেছে। আল-কুরআনের বাণী :

ক.

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা। [৮]

খ.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [৯]

গ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। [১০]

দুই. ধর্মান্তরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। [১১]

ধর্মান্তরের জন্য খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা বড় অংক খরচ করে থাকেন। তাদের লক্ষ্য নিম্নরূপ :

ক. খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা

এ লক্ষ্যে তারা মুসলিম দেশগুলোকে যুদ্ধ-বিগ্রহে ও নানা অশান্তি-অরাজকতায় ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। মুসলিম দেশে আসার ভিসা দেয়ার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।

খ. অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা

গ. মুসলিমদেরকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে আনা :

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। একজন মুসলিমকে নামমাত্র মুসলিমে পরিণত করা এবং তার সাথে আল্লাহর সম্পর্কে ছেদ ঘটানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য। দীর্ঘ মেয়াদে যা ইসলাম ধ্বংসে সমূহ সাহায্য করবে।

ঘ. ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা

ঙ. ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার চেয়ে খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রিয় করে তোলা

এ লক্ষ্যের বাস্তবায়ন স্পষ্ট হয় শিক্ষার সিলেবাসে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, ইংরেজী মাধ্যমের সয়লাব এবং বিভিন্ন এন.জি.ও পরিচালিত স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি পরিচালনার মধ্য দিয়ে।

চ. পশ্চিমের উন্নতি খ্রীষ্টধর্মের কল্যাণেই, এ ধারণা বদ্ধমূল করা

ছ. মুসলিম দেশগুলোতে বৃহদাংশে খ্রীস্টান বানানো, প্রবেশ করানো

জ. মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করা

তিন. ধর্মান্তরের মাধ্যমগুলো কী ?

ধর্মান্তর একটি জটিল প্রক্রিয়া। এটি মানুষের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনার নাম, যা কখনোই সহজে হয় না। তাই তা সহজ করতে তারা বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

ক. বিভিন্ন মুসলিম দেশে মিশনারি দল পাঠানো

মিশনারি দল হলো বিভিন্ন ধর্মীয় দল, যারা শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি সেবার মাধ্যমে বা সরাসরি ইঞ্জিল প্রচারের কাজ করেন। [১২]

খ. বই-পত্র, আর্টিকেল ছাপানো – যেগুলো ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ ছড়ায়, ইসলামকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে হেয় করে তোলে

এসবের মধ্যে সিলেবাসের পাঠ্য বই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ. চিকিৎসা – এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে রোগের ছড়াছড়ি এবং সে তুলনায় মুসলিম রাষ্ট্রের চিকিৎসা-মাধ্যমের কমতি তাদের সুযোগ করে দিচ্ছে।

যেখানে মানুষ আছে, সেখানেই রোগ আছে। আর যেখানে রোগ আছে, সেখানেই চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। আর চিকিৎসকের প্রয়োজন যেখানে, সেখানেই ধর্মান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।[১৩]

ঙ. শিক্ষা পদ্ধতি – স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা, যেগুলোতে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খ্রীষ্টধর্মের বীজ বপন করা হয়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোও অনেক ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রখ্যাত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক হেনরী জেসব বলেন, খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে শিক্ষা হলো লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। আর সেই লক্ষ্য হলো, মানুষকে মাসীহের নেতৃত্বে নিয়ে আসা, আর তাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেয়া যেন তারা মাসীহী জনগণে পরিণত হয়; পরিণত হয় মাসিহী গোষ্ঠীতে। [১৪]

চ. নাস্তিকতা ছড়ানো :

ধর্মান্তরের একটি অন্যতম উপায় হলো নাস্তিকতা ছড়ানো। ধর্মান্তরকারীদের মূল উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করা। যদি তাদের উদ্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী বানানো যায়, তাহলে তো কথাই নেই। তা সম্ভব না হলে অন্তন নাস্তিক বানানো গেলেও ইসলাম থেকে তাদের বের করা যায়।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারক জেমের বলেন, ‘‘তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করা। যেন সে এমন এক সৃষ্টে পরিণত হয়, যার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই।’’[১৫]

চ. মিডিয়ার ব্যবহার – প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও ইন্টারনেট মিডিয়ার ব্যবহার করে তারা ইসলামের অপমান করছে, ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ ঢেলে দিচ্ছে। ফলে মানুষ খ্রিষ্টান না হলেও অমুসলিম বা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে।

আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে কোনো লেখনী, বক্তব্য, দলীল ইত্যাদির চেয়েও হাজার গুন বেশি শক্তিশালী।

ফ্রেড ওকারোড বলেন, এটা স্পষ্ট যে মিডিয়া আজ অনত্যম বৃহৎ মাধ্যম, যার মাধ্যমে সহজেই মধ্যপ্রাচ্য আর উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের দ্বারে পোঁছা যায়। কেননা আমাদের জানা মতে মিডিয়া সীমানার প্রাচীর ভেঙে দিতে পারে, সমুদ্র আর মরুভূমি পাড়ি দিয়ে দূর্গম অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।[১৬]

এসব মিডিয়াতে তারা কয়েক ভাবে কাজ করে থাকে :

১. সরাসরি খ্রীষ্টধর্মের দিকে আহ্বান করা, তাদের বৈশিষ্ট্য, ভাতৃত্ব, মায় ইত্যাদি বড় করে দেখানো।

২. মুসলিমদের আকীদা ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ ছড়ানো ও ব্যঙ্গাত্বক ভাবে তুলে ধরা। এ ক্ষেত্রে নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন সবই ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী ছড়িয়ে চরিত্র নষ্ট করা, লজ্জা কমিয়ে আনা, আত্মমর্যাদা ভুলিয়ে দেয়া এবং নানা রিপুতে ডুবিয়ে দেয়া। চরিত্র বিনষ্টকারী পণ্য সুলভ মূল্যে ও আকর্ষণীয় উপায়ে বাজারজাত করা। যেন এরপর এসব মানুষকে সহজেই যে কোনো দিকে ডাকা যায়। এমনকী আল্লাহর সাথে নাফরমানী করতেও তাদের ডাকতে অসুবিধা না হয়।

১৯৮৬ সনের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে, মিডিয়া ও যোগাযোগ খাতে ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় ১১৯৬৫ ডলার পৌঁছে গেছে।[১৭]

এই তিনটি ছাড়াও আরো অনেক মাধ্যম চিন্তা করলেই পাওয়া যাবে। তাদের মাধ্যমগুলো সীমিত নয়। আল্লাহ বলেন:

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। [১৮]

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [১৯]

চার. ধর্মান্তর মোকাবেলার উপায় কী ?

ক. দাওয়াত : ধর্মান্তরকারীদের যে কোনো লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার প্রধান সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় মুসলিমদের দুর্বল ঈমান। কাজেই ধর্মান্তর মোকাবেলায় এই দুর্বল ঈমানকে সবল করার চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। যা আল-কুরআনেরই একটি আয়াতের মর্মার্থ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [২০]

মুসলিমদের ঈমান শক্তিশালী করার জন্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস করার জন্য দাওয়াতি কাজকে আরো বেগবান করতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ খিদমত আরো দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে হবে।

খ. গবেষণা-লেখালিখি : ধর্মান্তরের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম বই-পত্র ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ। আমাদের লেখকদের এ বিষয়ে সচেতনতামূলক ও ঈমানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশি বেশি বই-পত্র প্রকাশ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশে উৎসাহী হতে হবে।

এছাড়া শিক্ষার সিলেবাসের জন্য উপযোগী বই প্রণয়নেও মনোযোগী হতে হবে। মনে রাখার বিষয়, শিক্ষাই ধর্মান্তরের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

গ. মিডিয়া : মিডিয়া যে কোনো কিছু প্রচারের একটি অদ্বিতীয় মাধ্যম। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেট মিডিয়া এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হকপন্থী আলেমদের এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বাতিলপন্থীদের শক্ত অবস্থান তৈরীর সুযোগ করে দিচ্ছে। আর প্রত্যেক বাতিলই কোনো না কোনো ভাবে ধর্মান্তরের চক্রান্তকারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যকারী রূপে কাজ করে যাচ্ছে। বাতিলের সয়লাবই নাস্তিকদের নাস্তিক হতে উৎসাহিত করে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে সন্দেহ ঢোকায়।

এ বিষয়টা নিয়ে আলেমদের আরো গভীর দৃষ্টি দেয়া এখন সময় ও ঈমানের দাবী।

৪. সাহায্য সংস্থা : সমস্যা যেখানে, সেখানেই সমাধানের প্রয়োজন। আর সমাধানের প্রয়োজন যেখানে, সেখানেই ধর্মান্তরের কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যেমন, আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি যদি রাষ্ট্র মেটাতে না পারে, তখন অন্যরা এ সুযোগকে কাজে লাগায়। কাজেই ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষীদের কর্তব্য হলো, দলমত নির্বিশেষে আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা। সাহায্য সংস্থা, সাহায্য সংগঠন ইত্যাদি তৈরী করা। তাহলে আর সুযোগসন্ধানীদের সুযোগ থাকবে না।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি : বলা হয়, অর্থনীতিই হলো সমাজের মূল চালিকাশক্তি। আর অর্থনীতির গোড়ায় আছে ব্যবসা-বাণিজ্য। কাজেই ইসলামের আলোকে ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন প্রচারনা ইত্যাদি সবকিছুই ধর্মান্তরের চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত নস্যাত করে দিতে পারে।

ব্যবসায়িক ব্রান্ড, বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড সবই আজ ধর্মান্তরের প্রচারনায় লিপ্ত। এ দিকটায় গভীর দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে।

৬. **অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়াঃ** অমুসলিম তথা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। এবং এটা বেশ গুরুত্বের সাথেই করা দরকার। আমরা ইতোমধ্যেই দুনিয়ায় দাওয়াত দেনেওয়ালা ভাই যেমন, জাকির নায়েক বা ইউসুফ এস্টেসসহ আরো বহু ভাইয়ের দাওয়াতের ফল দেখেছি।

৭. মুরতাদদেরকে হত্যা করাঃ যারা আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হবে তাদেরকে দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত হুদুদ অনুসারে হত্যা করতে হবে।

এছাড়া :

ক. মুসলিমদের মৌলিক আকীদাগুলো শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি এবং সাধারণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অন্তরে গেঁথে দেয়া।

খ. উম্মতের সর্বস্তরে দ্বীনের গুরুত্ব এবং দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ ছড়িয়ে দেয়া।

গ. যেসব মাধ্যম/মিডিয়া খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকে উৎসাহিত করে, সেসব সম্পর্কে কঠোর অবস্থান নেয়া; জনগণকে সতর্ক করা; সম্ভব হলে সেগুলো প্রচার/প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

ঘ. ধর্মান্তরের পদ্ধতি, সমস্যা, ক্ষতিগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা। ধর্মান্তরকারীদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা।

ঙ. মুসলিমদের জীবনের যাবতীয় বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিককে প্রাধান্য দেয়া।

চ. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অমুসলিম দেশে সফর করা থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে সতর্ক হওয়া।

ছ. মুসলিমদের পরস্পরিক সহযোগিতামূলক সংগঠন গড়ে তোলা। যেগুলো দরিদ্র মানুষের উপকার করবে, অসহায়ের পাশে দাঁড়াবে। যেন এসব বিষয়ে ধর্মান্তরকারীদের চক্রান্তে পড়তে না হয়।

পাঁচ. কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান :

ক. ইন্দোনেশিয়ায় গত চল্লিশ বছরে খ্রিস্টানদের মোট সংখ্যা ১.৩ মিলিয়ন থেকে ১১ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে।[২১]

খ. ১৯৬০ এর পূর্বে নেপালে কোনো খ্রিস্টান অফিশিয়ালি বসবাসের সুযোগ পেত না। এখন সেখানে ৭৫টা জেলার সবগুলোতে চার্চ আছে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন খ্রিস্টান জনসংখ্যা নিয়ে।[২২]

গ. Book of Acts এ একজন চার্চ লিডার তার বন্ধুকে লিখেন, “তোমাদের শক্তিশালী প্রার্থনায় প্রভু জানুয়ারী থেকে জুনে ২০০৬ এর মধ্যে ৪৪৫২ জনকে রক্ষা করেছেন (ধর্মান্তর করেছেন) এবং ১৫০টা চার্চ স্থাপন করেছেন। প্রার্থনার অনুরোধ : আমাদের লক্ষ্য ২০০৬ এ ৩০০ চার্চ স্থাপন করা এবং ৯০০০ মানুষকে রক্ষা করা (ধর্মান্তর করা)।[২৩]

ঘ. ১৮৮১ সনে বাংলাদেশে প্রতি ৬০০০ মানুষে একজন খ্রিস্টান ছিল। ২০০০ সনে তা এসে দাঁড়ায় ১১ জনে একজন। ২০১৫ তে তাদের লক্ষ্য হলো প্রতি তিনজনে একজন।[২৪]

ঙ. ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবীর ৭ম বৃহত্তম খ্রিস্টধর্মী দেশ। ২০২৫ এ তা ৫ম এ উন্নীত হবে। [২৫]

চ. আর ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবী ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। যা ২০২৫ এ ৩য় তে চলে যাবে।[২৬]

ছ. আশার কথা হলো, পৃথিবীর ১০ বৃহত্তম খ্রিস্টধর্মী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ নেই। আর বৃহত্তম মুসলিম দেশের তালিকায় ২০০৫ এ বাংলাদেশ ৩য়, কিন্তু ২০২৫ এ ২য় হয়ে যাবে।[২৭] তবে ভারতের মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রভাব বাংলাদেশকে কোথায় দাঁড় করায় সেটাই দেখার বিষয়।

জ. ১৫ই জানুয়ারী, ২০১২ এর হিসাব মতে ইন্টারনেটে মোট পেইজের সংখ্যা ৮.৩৫ বিলিয়ন (৮৩৫ কোটি)।[২৮] তবে দু:খের বিষয় হলো, ইন্টারনেটে প্রতি সেকেন্ডে ২৮,২৫৮ জন ব্যবহারকারী অশ্লীল পেইজ ভিজিট করে থাকেন।[২৯]

ঝ. ৭৫০ জন মুসলিম থেকে ক্রিস্টান কনভার্টের ওপর একটি জরিপ করা হয়। যা থেকে ৫টি কারণ উদঘাটন করা হয়, যে কারণে তারা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন।

১. খ্রিস্টানদের জীবন-যাপন পদ্ধতি। **২.** প্রচলিত ইসলামের প্রতি অনাগ্রহ। এবং **৩.** বাইবেলের ভালবাসার দীক্ষা। [৩০]

এই জরিপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, যাদের খ্রিস্টান বানানো হয়, তাদেরকে মুসলিমদের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়া হয়। এবং প্রচলিত ইসলামের নানা অসঙ্গতিগুলোকে তাদের কাছে মৌলিক ইসলাম রূপে পেশ করা হয়, যার ফলে তাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। এবং পরিশেষে বাইবেলের ভালবাসার আহ্বান তুলে ধরা হয়। অথচ আল-কুরআনে

প্রতিটি সূরায় এবং রাসূল স. তাঁর হাদীসে যে ভালবাসার আহ্বান জানিয়েছেন, তার চেয়ে বড় আর কোনো ভালোবাসার আহ্বান হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন, দয়াশীলদের মহান দয়ালু (আল্লাহ তা'আলা) দয়া করেন। পৃথিবীতে যারা আছে (মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি) তাদের প্রতি দয়া করো। তাহলে উপরে যিনি আছেন (আল্লাহ তা'আলা) তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। [৩১]

এ ছাড়াও দয়া, মায়া আর ভালোবাসার হাদীস রাসূলের স. হাদীস ভান্ডারে অসংখ্য। তিনি নিজেই ছিলে দয়ার জীবন্ত প্রতীক। তাঁর কাছে একজন মুসলিম যে মায়া ও ভালোবাসা পেত, একজন অমুসলিমও সেই ভালোবাসা নিয়ে ফিরে যেত।

ছয়. কিছু সংবাদ শিরোনাম :

ক. বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের গরিব হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপপ্রচেষ্টা [৩২]

খ. ময়মনসিংহে ৫৫ মুসলিমকে ধর্মান্তরের চেষ্টা : ৩ ধর্মযাজক আটক [৩৩]

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র : সেনা সদরের হুঁশিয়ারি [৩৪]

ঘ. দামুড়হুদায় চিকিৎসা সেবার নামে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের সময় ৬ জন আটক [৩৫]

ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গড়তে বিভিন্ন তত্পরতা [৩৬]

চ. তানোরে সাঁওতাল সম্প্রদায় ধর্মান্তরিত হচ্ছে [৩৭]

ছ. পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ নিয়ে প্রশ্ন : খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলই কি লক্ষ্য? [৩৮]

---

[১] The ARDA (Association of Religious Data Archives), http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_19_1.asp

[৪] বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের গরিব হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপপ্রচেষ্টা, http://www.hindupage.org/ ১৯-২-২০১১

[৫] পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র : সেনা সদরের হুঁশিয়ারি, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৫-৪-২০১১, http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108

[৬] التنصير، تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين, আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আস সালিহ, দারুল কুতুবি ওয়াস সুন্নাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

[৭] التحذير من وسائل التنصير, আল লাজনাতুত দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা

[৮] আল-কুরআন, ২:১০৫

[৯] আল-কুরআন, ২:১০৯

[১০] আল-কুরআন, ৩:১০০

[১১] আল-কুরআন, ৮:৩৬

[১২] http://en.wikipedia.org/wiki/Missionary

[১৩] التبشير والاستعمار, মুস্তাফা খালিদী, পৃষ্ঠা : ৫৯৫

[১৪] حقيقة التبشير, আহমাদ আব্দুল ওয়াহহাব, পৃষ্ঠা : ১৬৬

[১৫] تنصير المسلمين পৃ:২০

[১৬] التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي পৃ:৫৩২

[১৭] مجلة الدعوة السعودية সংখ্যা ১৬৬৪

[১৮] আল-কুরআন ৮:৩০

[১৯] আল-কুরআন ৯:৩২

[২০] আল-কুরআন ২:২০৮

[২১] http://prayerfoundation.org/ এর সূত্র মতে Operation World

[২২] http://prayerfoundation.org/ এর সূত্র মতে Operation World

[২৩] http://prayerfoundation.org/ এর সূত্র মতে Vision 2020

[২৪] Challenges of Islamic Dawah in Bangladesh, নেয়া হয়েছে Nuruzzaman, Bangladesh in the Web of Creeping Colonialism পৃ:৬৪ থেকে

[২৫] www.worldchristiandatabase.org

[২৬] www.worldchristiandatabase.org

[২৭] www.worldchristiandatabase.org

[২৮] http://www.worldwidewebsize.com/

[২৯] http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html

[৩০] http://www.christianitytoday.com/

[৩১] সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪১

[৩২] http://www.hindupage.org/ ১৯-২-২০১১

[৩৩] দৈনিক আমারদেশ, ২৭-৫-২০১০
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2010/05/27/33826

[৩৪] সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৫-৪-২০১১
http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=1108

[৩৫] সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১-৪-২০১১
http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=956

[৩৬] দৈনিক আমারদেশ, ১২-৮-২০১১
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/12/98820

[৩৭] দৈনিক আমারদেশ, ৯-৮-২০১১
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/09/98153

[৩৮] দৈনিক আমারদেশ, ১৩-৮-২০১১
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2011/08/13/98854

খ্রিস্টান মিশনারীদের ভয়ংকর অপতৎপরতা ও সরকারের অস্বাভাবিক নিরবতা।

বদর বিন মুগীরা

বাংলাদেশ আজ খ্রিস্টান ধর্মের অভয়ারণ্য পরিণত হচ্ছে।দিনকে দিন বেড়ে চলেছে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী।বিগত ২০ বছরে রাঙ্গামাটি,খাগড়াছড়ি,বান্দরবানে প্রায় লক্ষাধিক লোক খ্রিস্টান ধর্মে প্রবেশ করেছে।

একটি দৈনিক পত্রিকার '১২ আগস্ট ২০১১'সংখ্যায় প্রথম পাতায় ছাপানো একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল-'পার্বত্য চট্টগ্রামকে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গড়তে বিভিন্ন তৎপরতা।' রিপোর্টে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অধিশাখা থেকে তৈরি করা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, তিন পার্বত্য জেলাকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গড়ে তোলার

তৎপরতা চালাচ্ছে বিদেশি কয়েকটি দাতা সংস্থাসহ কয়েকটি এনজিও। দরিদ্র উপজাতীয় সম্প্রদায়কে অর্থ-বিত্তের লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার হার আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। গত দুই দশকে শুধু খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ১২ হাজার ২শ উপজাতীয় পরিবারকে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকারী অন্যান্য সংস্থার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তিন পার্বত্য জেলা- খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪ টি গির্জা উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ গির্জাগুলোকে কেন্দ্র করেই দেশি-বিদেশি এনজিও ও অন্যান্য সংস্থা তাদের সমস্ত তৎপরতা চালাচ্ছে।

এনজিওগুলোর মধ্যে খাগড়াছড়িতে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ (সিএফডিবি), বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ফেলোশিপ, খাগড়াছড়ি জেলা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ফেলোশিপ, ক্রিশ্চিয়ান সম্মেলন কেন্দ্র খাগড়াছড়ি, সাধু মোহনের ধর্মপল্লী, বাংলাদেশ ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ক্রাউন ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ইত্যাদি। খাগড়াছড়ি জেলায় ৭৩টি গির্জা রয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজারের অধিক পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে।

প্রতিবেদনে বান্দরবান বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলায় গির্জা রয়েছে ১১৭টি। এখানে খ্রিস্টান ধর্মবিস্তারে কাজ করছে ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি), গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (গ্রাউস), কারিতাস বাংলাদেশ, অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ অব বাংলাদেশ, ইভেনজেলিক্যাল ক্রিশ্চিয়ান চার্চ (ইসিসি) ইত্যাদি। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এ সংগঠনগুলো বান্দরবানে ৭ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে খ্রিস্টান পরিবারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

রাঙামাটিতে ক্যাথলিক মিশন চার্চ, রাঙামাটি হোমল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ও রাঙামাটি ব্যাপ্টিস্ট চার্চ প্রায় ১ হাজার ৬৯০ উপজাতীয় পরিবারকে খ্রিস্টান পরিবারে পরিণত করেছে।

প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়,খ্রিস্টান ধর্ম দ্রুত বিস্তারের ফলে উপজাতিরা তাদের সংস্কৃতি,সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি,ইতিহাস-ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে।ভবিষ্যতে কোন স্বার্থান্বেষী মহল ঐ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে কাজে লাগিয়ে তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে।

সরকার এই ক্ষেত্রে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেওয়া বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিশিষ্টজনেরা এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তারা তাদের মন্তব্য বলেন,খ্রিস্টান মিশনারীগুলো অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।খ্রিস্টান এনজিও ও তাদের দাতা সংস্হাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'পূর্ব তিমুর' বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

এছাড়াও খ্রিস্টান এনজিওগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের তৎপরতা অব্যহত রেখেছে।রাজশাহী-নওগার সাওতাল, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর ও মধুপুর-শেরপুরের গারো উপজাতীয়দের মাঝেও টাকা-পয়সার জোরে ব্যাপক হারে খ্রিস্টান বানানোর কাজ চলছে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের উপর নজর রাখলে বুঝা যায়,খ্রিস্টান এনজিওগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দ্রুতই ফুরিয়ে পাচ্ছে।যদি এখনও সরকার এই অপতৎপরতা সম্পর্কে সচেতন না হয়,তাহলে বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে কঠিন বিপদ মোকাবেলা করতে হবে।

লাদেশের পার্বত্য এলাকায় ভিন দেশী সংস্কৃতি প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র!

- ডআ ফ ম খালিদ হোসেন .

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে এন জি ও এবং আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টান লবি ভিন দেশী সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী নানা মুখী চক্রান্ত চালিয়ে আসছে। চিকিৎসা, সমাজ ও মানবতার সেবার অভিনয়ে তারা মূলতঃ পার্বত্য এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইউরোপীয় জীবনাচার ও দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছে। মুঘল আমলেই এদেশের প্রতি এন জি ও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের শ্যেন দৃষ্টি পতিত হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে মিশনারীগণ ভিন দেশী সংস্কৃতির বিকাশ ও ধর্মান্তরের যে প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করেন, পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে তার ক্রমবিকাশ সাফল্যের সাথে অব্যাহত থাকে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, হাসপাতাল স্থাপন, ঋণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি মুখরোচক কর্মসূচীর আড়ালে রয়েছে এ দেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করার নীল নকশার বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর অধিবাস। শত বছর ধরে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ২০ লাখ আদিবাসী ক্রমাগত প্রান্তীয় পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চরম

দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাহার, মৃত্যু, মহামারী, অপুষ্টি ও স্যানিটেশন সমস্যা তাদের নিত্যসঙ্গী। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান এই পাঁচটি মৌলিক মানবাধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি.উসিথ মং বলেন, রাখাইনরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই অঞ্চলে আদিম অধিবাসী। প্রায় ৩৩ শতাংশ রাখাইন এখন ভূমিহীন আর গত ৩৫ বছরে পটুয়াখালীতে প্রায় ৯০ শতাংশ রাখাইনকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে।১৯৯১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন সংখ্যা ১০ লাখ ৫ হাজার ৩৬২ জন। অধিকাংশ চাকমা ও মারমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, টিপরা অধিবাসিরা হিন্দু ধর্মের আর মিজো বম ও খেয়াং খ্রিষ্টান। কিছু কিছু গোত্র আত্মা, প্রাণী ও উদ্ভিদের পূজারী (বাংলাপিডিয়া, ৫খন্ড, পৃ.৩৭১-২)।

সাধারণভাবে এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে পাহাড়িরা অত্যন্ত কষ্টে আছে, 'মানুষ'করার জন্য নানামুখী সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের পৃথক সত্তা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি বক্তব্য দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও প্রচুর শোনা যায়। এর সূত্র ধরে বিদেশি ফান্ড দ্বারা পরিপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে এনজিও এখন তিন পার্বত্য জেলায় সক্রিয় আছে। কিন্তু এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আর্ত-মানবতার সেবার নামে এসব এনজিও'র বেশিরভাগই আসলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার কাজে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ কাজে তাদের সাফল্য রীতিমত চোখ ধাঁধানো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে আমার দেশ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে,গত ২০ বছরে সেখানে ১২ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। ওই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। খাগড়াছড়ি জেলায় আছে ৭৩টি গির্জা। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজার ৩১টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে। বান্দরবান জেলায় গির্জা আছে ১১৭টি। এখানে একই সময়কালে খ্রিস্টান হয়েছে ৬ হাজার ৪৮০টি উপজাতীয় পরিবার। রাঙামাটিতে ৪টি চার্চ খ্রিস্টান বানিয়েছে ১ হাজার ৬৯০টি উপজাতীয় পরিবারকে। এগুলো তুলনামূলকভাবে হাল আমলের হিসাব। পাহাড়ি যেসব জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই (এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১)।

পাহাড়িদের নিজস্ব সংস্কৃতি অটুট রাখার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনকারী পশ্চিমা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদদে চলা ধর্মান্তকরণ সেখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, উপজাতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ আজ আক্ষরিক অর্থেই বিপন্ন। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া পাহাড়িদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি যারা ঘটাচ্ছে তারা যদি পাহাড়িদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শিকড় কেটে দিতে সক্ষম হয় তবে তা বাংলাদেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠবে। এভাবে দেশের একটি স্পর্শকাতর এলাকায় ডেমোগ্রাফির নাটকীয় পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। ত্রাণ ও সেবার নামে আসলে ওই অঞ্চলের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া লোকজনকে ধর্মান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বলে জোরালো অভিযোগ রয়েছে। একথা সত্য যে, আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সমতলবাসী বাঙালিরা পাহাড়িদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা করিনি। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ব্রিটিশ রাজশক্তি

ঔপনিবেশিক আমলে বিশেষ মতলব নিয়ে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিল যাতে পরস্পরের মধ্যে সার্বিকভাবে দূরত্ব তৈরি হয়। তাদের সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফল এখন পাকতে শুরু করেছে বলে মনে হয় (এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১)।

ড. উইলিয়াম কেরি, ড.টমাস, রিচার্ড হলওয়ে, ফাদার ক্লাউজ বার্লার, টরবেন ভি পিটারসন, আলফ্রেড রবিন মন্ডল ও ড.অলসন এর মতো লোকেরা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাইবেলের শিক্ষা, কৃষ্টি ও আদর্শ প্রচারের জন্য বাংলা ভাষা রপ্ত করেন। ১৭৯৩ সালে মিশনারীদের একটি শক্তিশালী দল বাংলাদেশে আসেন। মি.কেরি ও মি. পাওয়েল মিলে দিনাজপুরে একটি ক্ষুদ্র চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন যা বাংলাদেশে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট ও প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চ। মি.কেরি নতুন আঙ্গিকে বাংলা ব্যাকরণ সংশোধন করেন এবং ১৮০০ সালে ইংল্যান্ড থেকে বাংলা বর্ণ মালার ছক এনে কলকাতার শ্রীরামপূর মিশন থেকে বাংলায় বাইবেল মুদ্রন ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ড. কেরি ‘কথোপকথন’ ও ‘ইতিহাসমালা’ নামক বাংলায় দু’টি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় ভারতীয় উপমহাদেশে ৯০টি প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান মিশনারী সংস্থা কর্মরত ছিল। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংখ্যা এর বাইরে (মাসিক তরজমানুল কুরআন, লাহোর, মার্চ, ১৯৬১)। এদেশে প্রতিকুল পরিবেশে খ্রিষ্ট ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ও বিকাশে তাঁরা যে ত্যাগ ও সাধনা করেন তা রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চন্দ্রঘোনা, মালুমঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহী সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করে কুষ্ঠ রোগ সহ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার চালিয়ে আসছে একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে, তা হলো এ দেশে খ্রিষ্ট ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার। এই সব হাসপাতাল হলো মূলতঃ মানুষ ধরার ফাঁদ ও ষড়যন্ত্রের নীল কুঠি। মিশনারীদের এই নিরন্তর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। উপজাতীয় জন গোষ্ঠীর দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবকে পুঁজি করে খ্রিষ্টান এনজিও কর্মি ও মিশনারী পাদ্রীরা দূর্গম পার্বত্য এলাকায় নীরবে-নিভৃতে ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে কর্মতৎপর এনজিও’র সংখ্যা ৩০ হাজার। এই দেশে বহুজাতিক কোম্পানির আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে এবং অসহায়, নিঃস্ব, নিরক্ষর ও প্রপীড়িত মানুষকে সেবা করার নামে ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও খ্রিষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করার অমানবিক তৎপরতায় যেসব এনজিও জড়িত রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে: ১.কারিতাস ২.এমসিসি (মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি) ৩.বাংলাদেশ লুতারান মিশন ৪.দীপ শিখা ৫.স্যালভেশন আর্মি ৬.ওয়ার্ল্ড ভিশন ৭.সিডিএস (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস) ৮.আরডিআরএস (রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস) ৯.সিসিডিবি (খ্রিষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট) ১০.হিড বাংলাদেশ ১১.সেভেনথ ডে এ্যডভেঞ্চারিষ্ট ১২.চার্চ অব বাংলাদেশ ১৩.প্লান ইন্টারন্যাশনাল ১৪. সুইডিস ফ্রি মিশন ১৫.কনসার্ণ ১৬.এডরা ১৭.অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিষ্ট সোসাইটি ১৭. ফ্যামেলিজ ফর চিলড্রেন ১৮. ফুড ফর হাংরী ইন্টারন্যাশনাল। এই সব সংস্থার বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ খ্রিষ্টানদের বা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের স্বার্থে, নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিদেশী কনসালটেন্টের পেছনে ব্যয়িত হয়।

চার্চ অব বাংলাদেশ নামে একটি খ্রিষ্টান মৌলবাদী এন, জি, ও সংস্থা ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপন করে। স্থানীয় জনসাধারণের দরিদ্রতা, অভাব ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে হাসপাতালের পরিচালক ডা. ভিগা বি অলসন বিগত ৩৮ বছর যাবত খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে তৎপর রয়েছেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে অত্র এলাকায় যেখানে এক জন খ্রিষ্টানও ছিলনা সেখানে বর্তমানে দশ হাজার বয়স্ক নাগরিক খ্রিষ্টান হয়েছে এবং তাদের পরিবার সহ এই সংখ্যা বর্তমানে ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। মালুমঘাটের আশে পাশের জমি চড়া দামে উক্ত এনজিও কিনে নিচ্ছে ধর্মান্তরিতদের পুর্নবাসনের উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যে হায়দারের নাসি গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বিশাল গীর্জা গড়ে উঠেছে এবং অত্র এলাকায় ভিন দেশী সংস্কৃতির বিকাশ চোখে পড়ার মতো। কয়েক বছর আগে মালুমঘাট হাসপাতালের ডা. অলসন ১৩টি মুসলিম পরিবারের ২৫ জন গরীব মুসলমানকে ফুসলিয়ে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগে সংক্ষুব্ধ শত শত স্থানীয় মানুষ হাসপাতাল আক্রমন করে এবং যেসব ঘরে ধর্মান্তর করা হতো তা জালিয়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে ২০ জন পুলিশ সহ ১০০ ব্যক্তি আহত হয় (দৈনিক সংগ্রাম, ২৪অক্টোবর, ১৯৯২)।

ফস্টার প্যারেন্টস ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি এনজিও সংস্থা বাংলাদেশের ৯৬ হাজার পরিবারের একটি শিশুকে পোষ্য সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে খ্রিষ্টান বানানোর এক জঘন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতঃপূর্বে ধর্মান্তরিতকরণের অভিযোগে উক্ত সংস্থাকে জাকার্তা, বালি ও সুদান থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেভেনথ ডে এডভানচারিষ্ট চার্চ নামক একটি খ্রিষ্টান এনজিও ৮৫টি স্কুল পরিচালনা করে এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল বা এতিমখানায় কোন মুসলমান ছেলেকে ভর্তি করা হয় না। ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য খ্রিষ্টান কর্মচারী ও খ্রিষ্টান ছাত্রদেরকে সেখানে পাঠিয়ে থাকে। এই সংস্থাটি সেবার নামে বাংলাদেশের মানুষকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করেছে। হিড বাংলাদেশ নামের এনজিও মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে, ঢাকাস্থ বিহারী রিফিউজি ক্যাম্পে এবং সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খ্রিষ্ট সংস্কৃতির প্রচার ও খ্রিষ্টান জনগনের উন্নয়নের জন্য বছরে ৬ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয় করে। খ্রিষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (CCDB) জেনেভা ভিত্তিক একটি খ্রিষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের পরিবার প্রথা, সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ভেঙ্গে ইউরোপীয় আদলে নতুন সমাজ গড়ার কর্মসূচী বাস্তবায়নে লিপ্ত। সিসিডিবির বার্ষিক ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট থেকে খ্রিষ্টান জনগণ এবং ভবিষ্যতে যারা খ্রিষ্টান হবে তারাই উপকৃত হয়। সিসিডিব'র বর্তমান মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপজাতি ও আদিবাসীদের সকল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন স্থিতিশীল ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চত করার জন্য তাদের ছোট ছোট উদ্যোগকে সমর্থন দান, সকল পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি। ইউরোপের কয়েকটি দেশ,অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের দাতা সংস্থা ও খ্রিষ্টান মিশনারী সংগঠন বিশেষতঃ জেনেভার ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস, ব্রাড ফর দি ওয়ার্ল্ড, ইংল্যান্ডের খ্রিষ্টান এইড, নিউজিল্যান্ডের চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এবং হল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল চার্চ এইড ঢাকা সিসিডিবিকে অর্থ যোগান দেয়। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস বছরে একবার সিসিডিবি'র একটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। (বাংলাপিডিয়া,১০ খন্ড,পৃ.১৯৮-৯)। লুথারান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব বাংলাদেশের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত একটি শক্তিশালী এনজিও সংস্থার নাম রংপুর-দিনাজপুর রুরাল

সার্ভিস (RDRS)। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৬ লাখ লুথারেন বিশ্বাসী এই সংস্থার সাথে জড়িত। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডের লুথারেন চার্চ এই সংস্থাকে অর্থের যোগান দেয়। মি. টরবেন ভি পিটারসনের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সাল হতে এই সংস্থা নিরব-কৌশলে প্রায় ২১৮ কোটি ৬৯ লাখ ৯৮ হাজার ৪৭৬ টাকা ব্যয়ে বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী ও সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকার বদলে দেশের অভ্যন্তরে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণে সংস্থা অনাগ্রহী। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী একমাত্র দিনাজপুরেই ৩৫ হাজার সাঁওতাল খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। (মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, বাংলাদেশ-এনজিও উপনিবেশবাদের দূর্ভেদ্য জালে, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬১-৭৩; দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮১)

জনাব রেজাউল হক হেলাল সম্প্রতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সাজেক ইউনিয়নে দশ হাজার উপজাতির সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও ধর্মান্তরের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিয়েছেন। সাজেক ইউনিয়নটি সীমান্তবর্তী দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত যা আয়তনে বাংলাদেশের একটি জেলার সমান। নৈসর্গিক সৌন্দর্য লালিত এই উপত্যকায় পৌঁছতে খাগড়াছড়ি বা রাঙ্গামাটি শহর থেকে দু'দিন সময় লাগে। এই ইউনিয়নের বিশটি গ্রামে খেয়াং, রম, পাংখু, লুসাই উপজাতির বাস। সাজেক উপত্যকাটি ভারতীয় সীমান্ত রাজ্য মিজোরাম সংলগ্ন। বিশ বছর আগেও এখানে খ্রিষ্ট ধর্মের কোন নাম গন্ধ ছিল না। উপজাতীয়দের ভাষা, সংস্কৃতি সবই ছিল, আজ কিছুই নেই। শুধু ইংরেজীতে কথা বলাই নয়; সেখানকার অধিবাসীরা গীটার বাজিয়ে ইংরাজী গান গায়; মেয়েরা পরে প্যান্ট-শার্ট-স্কার্ট; এদের দেখে মনে হয় যেন বাংলার বুকে এক খন্ড ইউরোপ। জাতিতে তারা প্রায় সবাই খ্রিস্টান। দীর্ঘ দিন ধরে এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারীরা অনেক কৌশল ও টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে চলেছে। ইতোমধ্যে পাংখু উপজাতি পুরোপুরি খ্রিষ্টান হয়ে গেছে; বদলে গেছে তাদের ভাষা; এমন কি তাদের ভাষার হরফও ইংরাজী বর্ণমালায় রূপান্তর করা হয়েছে। এন জিও নাম ধারন করে কয়েকটি খ্রিষ্টান মিশনারী এই দুর্গম এলাকায় হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, চার্চ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। নিজস্ব উপজাতীয় আদি ভাষা ও সংস্কৃতি এরা হারিয়ে ফেলেছে (ইনকিলাব, ২০ মে ২০০৩)।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় গড়ে উঠেছে ক্রুশ চিহ্নিত সুদৃশ্য গীর্জা। প্রাথমিক ভাবে মিশনারীদের টার্গেট ছিল হিন্দু ও পাহাড়ী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং পরবর্তীতে মুসলমান। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও ময়মনসিংহের গহীন অরন্যে বসবাসরত আধুনিক সভ্যতার আলোকধারা থেকে বঞ্চিত মানুষ বিশেষত: চাকমা, মারমা, তনছইঙ্গা, চাক, খ্যাং, খূমি, বোম, মো, মুরুং, টিপরা, খাসিয়া, মনিপুরী, খেয়াং, পাংখু, লুসাই, মগ, গারো উপজাতির মধ্যে খ্রিষ্ট সংস্কৃতি ও ধর্মের বিকাশ এবং অনুশীলন তাদের জীবন ধারায় এনেছে ব্যাপকতর বৈচিত্র্য ও আমুল পরিবর্তন। প্রতিটি মানুষের জন্য একটি বাইবেল এবং প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গীর্জা (Every man a Bible and every People a Church) এ কর্মসূচীকে সামনে রেখে মিশনারীরা যে তৎপরতা বাংলাদেশে শুরু করেছিল তার লক্ষ্য পানে ছুটে চলেছে নিরন্তরভাবে। ১৯৩৯ সালে যেখানে বাংলাদেশে খ্রিষ্টানের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার, সেখানে

১৯৯২ সালে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে; ২০১২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটিতে৷ কট্টর মৌলবাদী এনজিও ওয়ার্ল্ড ভিশনের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯১ সালে একমাত্র গারো পাহাড় এলাকায় ১৬ হাজার ভোটার তালিকাভূক্ত হয় এবং খ্রিষ্টান জন শক্তি দাড়াঁয় ৫০ হাজারে৷

বর্তমানে হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে ৩০ হাজার খাসিয়া জনগণ বাস করে৷ পার্বত্য খাসিয়াদের বাসভূমি পশ্চিমে গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত৷ দেড় শতাধিক বছর পূর্বে খ্রিষ্টান মিশনারীরা খাসিয়াদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিল৷ বর্তমানে ৮০%-৯০% খাসিয়া খ্রিষ্টান, প্রায় প্রতিটি পুঞ্জিতে (গ্রাম) গির্জা আছে৷ প্রতি রোববারে খ্রিষ্টান খাসিয়ারা গির্জায় প্রার্থনা এবং পুঞ্জির বিষয়াদি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে৷ খ্রিষ্টান যাজকগণ অনেক সময় পুঞ্জির বিচার- আচারেরও দায়িত্ব পালন করেন৷ খ্রিষ্টান কৃষ্টি ও ধর্মে দীক্ষার ফলে খাসিয়াদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোই বদলে গেছে৷ খ্রিষ্টান খাসিয়ারা প্রোটেস্ট্যান্ট এদের মধ্যে ক্যাথলিক আদপেই নেই৷ খাসিয়া ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার অন্তর্ভূক্ত৷ বর্তমানে খাসিয়া ভাষা সীমান্তের ওপারে রোমান হরফে লেখা হচ্ছে৷ ইদানিং কালে খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় সাঁওতাল লিপির বর্ণমালাও রোমান হরফে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে (বাংলাপিডিয়া,-২খন্ড, পৃ.১০,১২; ৩খন্ড, ৭৯-৮৯)।

সাংবাদিক ষ্টালিন সরকার লিখেছেন যে, উত্তরাঞ্চলের ধর্মান্তরের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে৷ মুসলমান, হিন্দু আর সাওঁতালদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হওয়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ৷ বৃহত্তর রংপুর ও বৃহত্তর দিনাজপুরের আটটি জেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে খ্রিষ্টান মিশনারী৷ ওই সব চার্চে গত পাঁচ বছরে ১০ থেকে ১২ হাজার ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে৷ বেকারত্ব আর দারিদ্র্যকে পুঁজি করে মিশনারীর লোকজন ধর্মান্তরের টোপ দিচ্ছে মানুষকে৷ শুধু যুবক-যুবতী আর অভাবী মানুষকে নয়, কোমলমতি শিশুদেরও খ্রিষ্টান করার অপতৎপরতা চালাচ্ছেন পাদ্রীরা৷ তাঁরা আটটি জেলায় কমপক্ষে ৩০/৪০চি নার্সারী স্কুল খুলেছেন৷ এসব স্কুলের ক্লাসরুমে যিশুর প্রতিকৃতি সহ খ্রিষ্টিয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ছবি ও অনুষঙ্গ টাঙ্গিয়ে রাখা হয়৷ পাঠ্য বই পড়ার পাশাপাশি ওই সব ছবি দেখিয়ে কোমলমতি শিশুদের খ্রিষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয়৷ পাদ্রীদের ধর্মান্তরের এই মিশন চলতে থাকলে আগামী ১০/১২ বছরে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে লক্ষাধিক দরিদ্র ও বেকার যুবক খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে (পূর্ণিমা,১৬ জুন,২০০৪/১৭বর্ষ ৪০ সংখ্যা, পৃ.৩৯)।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারীদের এ সাফল্য নিঃসন্দেহে এ দেশের মুসলমানদের ব্যর্থতার দলিল৷ সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে মিশনারীরা এসে যদি আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিষ্টান র্ধম ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রচার করতে পারে তা হলে এত কাছের হয়েও আমরা মুসলমানরা কেন ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলাম৷ সাহায্যের হাত, সহানুভূতির হাত, সেবার হাত পার্বত্য ভাইদের প্রতি আমরা কেন সম্প্রসারন করতে পারলামনা৷ এ দায়িত্ব অবহেলার মাশুল একদিন এই দেশের মুসলমানদের দিতেই হবে৷ প্রায় বিশ বছর আগে পটিয়া আল- জামিআ আল- ইসলামিয়ার প্রাক্তন প্রধান পরিচালক হযরত আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ (রহ.) কাপ্তাই এর অদূরে সূখবিলাস ও বান্দরবান সদরে দু'টি দশ শয্যা বিশিষ্ট

আধুনিক দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সুবিধে প্রদানের যে মহৎ কাজ সূচনা করেছিলেন তা যথেষ্ট ইতিবাচক ফল দিয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হযরত হাজী সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এ ক্ষেত্রে আর কেউ এগিয়ে আসেননি।

আমাদের সীমান্তের ওপারে সেভেন সিস্টার নামে খ্যাত মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, হিমাচল, অরুনাচল প্রভৃতি পাহাড়ী অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন র্ধমান্তরিত খ্রিষ্টান। ঐ সব পাহাড়ী অঞ্চল সংলগ্ন বাংলাদেশের র্পাবত্য এলাকায়ও ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়ে উঠেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সুদৃশ্য গীর্জা ও মিশনারী স্কুল। সাম্প্রতিক আঞ্চলিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ঘটনাপ্রবাহ এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, একদিন চট্টগ্রামের র্পাবত্য অঞ্চল দক্ষিণ সুদান ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূরের মত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা লাভ করবে। গড়ে উঠবে বাংলাদেশের বুকে আরেকটি স্বাধীনদেশ। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপীয় দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে টার্গেট করে সামনে এগুচ্ছে। প্রায় দু'বছর স্থগিত থাকার পর জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) এই বছর রাঙামাটি, বিলাইছড়ি, বান্দরবান ও থানচিতে ২০ লাখ মার্কিন ডলারের 'কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী' নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন বিদেশী নাগরিককে (ব্রিটিশ ও ডেনিশ) অপহরণের পর বিদেশী সংস্থাগুলো তাদের তৎপরতা সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা উন্নয়নের নামে দেদার বৈদেশিক অর্থের দ্বারা নব দীক্ষিত খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের কাজে লিপ্ত রয়েছে। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের প্ল্যানের অধীনে তারা ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান যুবকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য, যুক্তরাস্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করে।

পরিস্থিতি এই ভাবে অব্যাহত থাকলে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সচ্ছল এবং রাজনৈতিক দিয়ে বিপজ্জনক খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। এই পাড়ের পাহাড়ীয় খ্রিষ্টানগণ সীমান্তবর্তী ওই পাড়ের পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত নব দীক্ষিত খ্রিষ্টানদের সাথে মিলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে। এই আশংকা অমূলক নয়। NGO তথা বেসরকারী সংস্থা গুলো কোন দেশের কোন সরকারের বন্ধু নয়। এনজিও'রা তাদের খ্রিষ্টান দাতাগোষ্ঠীর গোপন পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করে থাকে মাত্র। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় ছয়টি রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায় বহুদিন যাবত এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সুকৌশলে। সম্প্রতি ওইসব সংস্থার সঙ্গে এতদঞ্চলের উগ্রপন্থি সংগঠনের র্সম্পক থাকার খবর পাবার পর সিবিআই ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৮২০ টি এনজিও সংস্থাকে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কালো তালিকাভুক্ত করে ওই সব রাজ্যসমূহের জেলা প্রশাসকদের সর্তক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত এনজিওদের মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরায় ৬৯, মনিপূরের ১৯৭, আসামের ১৫১, নাগাল্যান্ডের ৭৮, সিকিমের ২, মেঘালয়ের ৩২৩ টি।

কোলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকা নয়াদিল্লীর সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে: কালো তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর বেশির ভাগই আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাবিস্তার এবং রোগ প্রতিরোধ সচেতনতার কাজ করে বলে সরকারি খাতায় পরিচিতি

রয়েছে। এসব কাজ করতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সরকারের কাছ থেকে নানা তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মনে করছে এসব তথ্য জঙ্গিরা তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে আরো খবর রয়েছে, বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জঙ্গীদের রিক্রুটিং 'এজেন্সি' হিসেবে কাজ করে।

খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানও স্বীকৃতি পেয়েছে পূর্ব তিমুরের পথ ধরে কারণ জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক ফোরামে রয়েছে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ষ্ট্রং লবি। ২০০২ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের সহায়তায় ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল। কাশ্মীর, মিন্দানাও, আরাকান, আচেহ, চেচনিয়া, দাগিস্তান, ফিলিস্তিন ও জিংজিয়াং অঞ্চলের মুক্তিপাগল জনতা আদৌ বর্তমান জাতিসংঘের অধীনে স্বাধীনতা পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এই সব এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমান।

খ্রিষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন রূপ দ্বিধা থাকা উচিৎ নয়। ১৮৫৭ খিষ্টাব্দে East India Company এর Board of Directors এর সভায় গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা মিশনারীদের উদ্দেশ্য বুঝতে একান্ত সহায়ক 'প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্য ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করেন, যাতে এতদঞ্চলের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারীদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এতদঞ্চলকে খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রত্যেকের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ' (তারীখে পাকিস্তান ও সিন্ধু সেকেন্ডারী স্কুল পরীক্ষা-১৯৬২ ইং, পৃঃ ৫০৪; দৈনিক আজাদ, ঢাকা, উর্দু পত্রিকার মতামত শীর্ষক নিবন্ধ,৩০ জৈষ্ঠ, ১৩৭৪ বাংলা)।

মুসলিম রাষ্ট্র সমুহে মিশনারী প্রেরক সমিতির সভাপতি মি.কিস জুয়াইমর মিশনারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা অত্যন্ত খোলামেলা এবং রীতিমত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন: 'আমাদের খ্রিষ্টান মিশনারীদের বড় উদ্দেশ্য এই যে, যেসব ছাত্র আমাদের স্কুল-কলেজ হতে শিক্ষা সমাপন করে বের হচ্ছে তারা নিশ্চিত রূপে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে, যদিও বের হওয়াটা আনুষ্ঠানিক নয়। অর্থাৎ নাম ও পরিচিতিতে খ্রিষ্টান না হলেও মন-মেজায, ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-চেতনা ইত্যাদিতে সে ইসলাম বিমুখ হয়েছে। শুধু এতটুকু নয়, বরং সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে আমাদের মিশনের এক জন বড় পৃষ্ঠপোষক। তার পক্ষ হতে আমাদের অনিষ্টের কোন প্রকার আশংকা নেই। সে আমাদের ও আমাদের মিশনের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করতে পারে না। এটা আমাদের সে সফলতা দুনিয়ায় যার নজীর নেই' (মাসিক বাইয়েনাত, করাচী, শা'বান-১৩৮৬ হিজরী)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ঐতিহ্যগত ভাবে খ্রিষ্টান মিশনারীদের বড় পৃষ্ঠপোষক। এই দু'রাষ্ট্র ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন চালিয়ে পৃথিবীর যে দেশ দখল করে সেখানেই রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় যাজকগণকে খ্রিষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের ব্যাপক সুযোগ অবারিত করে দেয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকের আর্থ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের আড়ালে খ্রিষ্টান ধর্ম বিকাশে বাইবেল প্রচারকদের অগ্রণী ভূমিকা সেই একই চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রতি কানাডার বৃহত্তম সংবাদপত্র Toronto Star 'মার্কিন বাইবেল প্রচারকরা

ইরাকের জন্য সুবৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছ’ এই শিরোনামে এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয় সাদার্ন ব্যাপটিষ্ট কনভেনশনের প্রেসিডেন্ট মি. চার্লস স্ট্যানলি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও স্বজন হারা ইরাকী জনগণকে তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে রিলিফ সরবরাহের পাশাপাশি খ্রিষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করার এক মহা পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন।

মি. চার্লস স্ট্যানলি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশের ইরাক আক্রমণের অন্যতম দোসর। চার্লস স্ট্যানলি আটলান্টার First Baptist Church এর প্রধান পুরোহিত। বিশ্বের বৃহত্তম টি ভি চ্যানেল ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (CNN) যা মার্কিন প্রশাসনের বশংবদ বলে কুখ্যাত, সেই চ্যানেলটির প্রধান দফতর ও আটলান্টায় অবস্থিত। গীর্জার প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন ছাড়াও চার্লস স্টানলি ইনটাচ মিনিস্ট্রি নামে একটি ধর্ম প্রচারণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন সেখান থেকে ১৪টি ভাষায় স্ট্যানলির ধর্মীয় ভাষণ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়ে থাকে। বুশ ইরাক আক্রমণের পূর্বে ফেব্রুয়ারী হতে চার্লস স্টানলি তাঁর বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় এই বক্তব্যটি প্রচার করতে থাকে ‘‘ঈশ্বর মার্কিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালকে সম্প্রসারণ ও মন্দকে প্রতিহত করার জন্য। অতএব এই সরকার বাইবেল প্রদত্ত নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মার্কিন জাতিকে রক্ষা এবং বিশ্বে যারা দাসত্বে আবদ্ধ রয়েছে তাদের মুক্ত করতে যুদ্ধে যাচ্ছে।’’ তাঁর এই ভাষণ আরবীতে অনুবাদ করে উপগ্রহ টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে সারা আরব জাহান বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে বারংবার প্রচার করা হয়। স্ট্যানলির প্রতিষ্ঠান ছাড়া মার্কিনী ডানপন্থী খ্রিষ্টানদের আরো বহু মিশনারী সংগঠন ইরাকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার কর্মকান্ড বিস্তার করতে প্রয়াসী হয়েছে। (মাঈনুল আলম, পূর্বকোন, ২৭ মে ২০০৩ পৃ.০৪) এমনিতে গোটা ইরাক জুড়ে আগে থেকে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী আছে প্রায় ১০ লাখ। মার্কিনীদের ছত্রছায়ায় এনজিও ও মিশিনারীদের অব্যাহত প্রয়াসের ফলে খ্রিষ্টানের সংখ্যা বাড়তে থাকবে ক্রমশ তারাই পাবে যুদ্ধোত্তর ইরাকে রাষ্টীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকুল্য। ফলশ্রুতিতে এক সময় লেবাননের মতো ইরাকে ও দেখা দিতে পারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি।

এন জি ও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীগণ ৯০ ভাগ মুসলমানদের এ দেশে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল পরিবর্তনের মতো সংঘাতমুখী যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যাচ্ছে তাতে নীরব বসে থাকা যায় না। একটি স্বাধীন দেশের জন্য এমন পরিস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক অনিবন্ধিত এন জি ও ২০০১ সালে অবৈধভাবে বিদেশ থেকে ৫৫ কোটি টাকা এনেছে এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, দেশী-বিদেশী ব্যাংকের মাধ্যমে পুরো অর্থ তারা ছাড় করে নিয়ে গেছে। আমরা এন জি ও দের দেশীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ বহির্ভূত সকল কর্মকান্ড ও ধৃষ্টতাপূর্ণ দৌরাত্ম নিষিদ্ধ করার দাবী জানাই। নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এন জি ও এবং মিশনারীদের কর্মকান্ড ঘনিষ্টভাবে মনিটরিং করা সময়ের অপরিহার্য দাবী।

ভয়াবহ পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুসলমানদের দাওয়াতী ও সেবার ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে বাস্তব কর্মসূচী হাতে নিতে হবে যাতে খ্রিষ্টান মিশনারীদের কবল থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, উত্তরাধিকার ঐতিহ্য ও লালিত কৃষ্টি রক্ষা করা যায়। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, আলিম সহ সর্বস্তরের মুসলমানদের এই বিষয়ে সুচিন্তিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বে খ্রিষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মাওলানা রহমতুল্লাহ

কিরানবী (রহ.), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.), আল্লামা কাছেম নানুতুভী (রহ.), মাওলানা শরফুল হক সিদ্দিকী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুংগেরী (রহ.), মুন্সী মেহেরুল্লাহ (রহ.) ও পন্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী (রহ.) যেভাবে বক্তৃতা, লেখনী ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন তা এখনো আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

রিদওয়ানুল কাদির :: তখন আমার বয়স ১১-১২ বছর। আমার বাবা কঠিন রোগে আক্রান্ত। হাসপাতালে ভর্তি করানোর মত আর্থিক সামর্থ্য আমার পরিবারের ছিল না। একদিন আমার দূরবর্তী এক আত্মীয় এসে বললেন, আমি এক হাসপাতালে চাকরি করি। তোমার বাবাকে সেখানে ভর্তি করে দাও। টাকা-পয়সা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। যা হোক তার কথামতো বাবাকে সেখানে ভর্তি করা হলো। তার আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। বরং হাসপাতালে নেয়ার প্রায় দুই মাস পর মারা গেলেন। হাসপাতালের চার্জ এল প্রায় ৩২ হাজার টাকা। কর্তৃপক্ষ বলল, সমস্যা নেই। তবে তোমরা প্রতি সপ্তাহে এখানে অন্তত একবার করে আসবে। এরপর প্রতি সপ্তাহে আমরা সেখান যেতাম। আমরা গেলে তারা আমাদের হাসপাতালের পেছনের দিকে নিয়ে যেত। সেখানে এক এলাহি কারবার। একটি বিরাট গির্জা। বাইরে থেকে কল্পনাই করা যায় না এখানে এত সুন্দর গির্জা থাকতে পারে। এভাবে তাদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। তারা আমাদের বিভিন্ন

উপহার-উপঢৌকন দিত। একপর্যায়ে তারা আমাদের কুরআন খুলে ওইসব আয়াত দেখাতে লাগলো, যেখান যিশুখ্রিস্টের (হজরত ঈসা আ.) বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। তার বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এভাবে তারা আমাদের বোঝাতে লাগলো, খ্রিস্টধর্মই প্রভুর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। কারণ বর্তমানে মুসলমানরা নানা প্রান্তে লাঞ্ছিত, অপদস্থ, অন্যদিকে খ্রিস্টানদের জয় জয়কার। ধীরে ধীরে তারা আমাদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। আমার মা, ভাইবোন সবাই ছিলাম গ-মূর্খ। আমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করে খ্রিস্টান হয়ে যাই। একবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসতে চাইলে তারা বলল, তোমাদের ওপর কত টাকার ঋণ আছে, স্মরণ রেখো। এছাড়াও আমরা আমাদের ধর্মে ফিরে যেতে চাইলে বিভিন্ন হুমকি ধমকি দিয়ে থাকে। এভাবেই চলছে আমাদের পরিবার।'

নিজ পরিবারের ধর্মান্তরিত হওয়ার কাহিনি বলছিলেন রাঙামাটির বাসিন্দা ক্যামেরুন। তার পূর্বনাম রবিউল হক। এনজিওর ফাঁদে পড়ে মুসলমান থেকে খ্রিস্টান হয়েছে তার পুরো পরিবার। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শত শত এনজিও এবং বিভিন্ন মিশনারি সংস্থা মানবসেবার মহান ব্রতের ছদ্মাবরণে সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন কৌশলে ধর্মান্তরিত করার কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

ষোলো কোটি জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ ছোট একটি দেশ, বাংলাদেশ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতি দেশটাকে খ্রিস্টান মিশনারিদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে কর্মতৎপর এনজিওর সংখ্যা বর্তমানে ৩০ হাজার। বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে ৩.৫টা বিদেশি এনজিও রয়েছে।

মিশনারির স্বর্গরাজ্য

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে এনজিও এবং আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান লবি ভিনদেশি সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মপ্রচারের লক্ষে সুদীর্ঘকালব্যাপী নানামুখী ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। চিকিৎসা, সমাজসেবা ও মানবসেবার ছদ্মাবরণে তারা মূলত পার্বত্য এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইউরোপীয় জীবনাচার ও দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, হাসপাতাল স্থাপন, ঋণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি মুখরোচক কর্মসূচির আড়ালে রয়েছে এদেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করার নীলনকশার বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। শতবছর ধরে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ২০ লাখ মানুষ ক্রমাগত প্রান্তীয় পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাহার, মৃত্যু, মহামারি, অপুষ্টি ও স্যানিটেশেন সমস্যা তাদের নিত্যসঙ্গী। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান এই পাঁচটি মৌলিক মানবাধিকার থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ ব্যাপারে রাখাইন

ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি. উসিথ মং বলেন, রাখাইনরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই অঞ্চলে আদিম অধিবাসী। প্রায় ৩৩ শতাংশ রাখাইন এখন ভূমিহীন আর গত ৩৫ বছরে পটুয়াখালীতে প্রায় ৯০ শতাংশ রাখাইনকে নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে।

আদমশুমারি

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ১০ লাখ ৫ হাজার ৩৬২ জন। তবে বর্তমানে তা ১৬ লাখের কাছাকাছি পৌঁছেছে। অধিকাংশ চাকমা ও মারমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, টিপরা অধিবাসীরা হিন্দুধর্মের আর মিজো বম ও থেয়াং খ্রিস্টান। কিছু কিছু গোত্র আত্মা, প্রাণী ও উদ্ভিদের পূজারী। (বাংলাপিডিয়া, ৫/৩৭১,২)
সাধারণভাবে এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে ‘পাহাড়িরা অত্যন্ত কষ্টে আছে’, ‘মানুষ করার জন্য নানামুখী সহযোগিতা প্রয়োজন’, তাদের পৃথক সত্তা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি বক্তব্য দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও প্রচুর শোনা যায়। এর সূত্র ধরে বিদেশি ফান্ড দ্বারা পরিপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে এনজিও এখন তিন পার্বত্য জেলায় সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর্তমানবতার সেবার আড়ালে এসব এনজিওর বেশিরভাগই আসলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার কাজে আদাজল খেয়ে নেমেছে।

সরকারি হিসাব

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২০ বছরে সেখান ১২ হাজার ২শ উপজাতি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দাসংস্থার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অধিশাখা থেকে তৈরি করা এ প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়েছে, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর কর্মকা- তদারকি করা প্রয়োজন, যাতে এনজিওগুলো মানুষের আর্তসামাজিক দুরবস্থার সুযোগে ধর্মান্তরের কাজ চালাতে না পারে। ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টধর্মের দ্রুত বিকাশ ঘটায় এখানে উপজাতিদের সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। প্রতিবেদনে সেবার নামে উপজাতিদের খ্রিস্টান বানানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত এনজিওগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

খ্রিস্টান বানাতে তৎপর বিভিন্ন এনজিও

তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা উপজাতিদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ গির্জাগুলোকে কেন্দ্র করে দেশি বিদেশি এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থা তাদের

সব তৎপরতা চালায়।

এনজিওগুলোর মাঝে খাগড়াছড়িতে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ (সিএফডিবি), বাংলাদেশ ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ফেলোশিপ, খাগড়াছড়ি জেলা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ফেলোশিপ, ক্রিশ্চিয়ান সম্মেলনকেন্দ্র খাগড়াছড়ি, সাধু মোহনের পল্লী, বাংলাদেশ ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ক্রাউন ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ইত্যাদি। খাগড়াছড়ি জেলায় গির্জা রয়েছে ৭৩টি। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজার ৩১টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে। সরকারি একটি প্রতিবেদনে বান্দরবান জেলা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলায় ১১৭টি গির্জা রয়েছে। এখানে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারে কাজ করছে ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি), গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (গ্রাউস), কারিতাস বাংলাদেশ, অ্যাডভেন্টিস চার্চ অব বাংলাদেশ, ইভেনজেলিক্যাল ক্রিশ্চিয়ান চার্চ ইত্যাদি। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত এ সংগঠনগুলো বান্দরবানে ৬ হাজার ৪৮০টি উপজাতি পরিবারকে খ্রিস্টান পরিবারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। রাঙামাটিতে ক্যাথলিক মিশন চার্চ, রাঙামাটি হোমল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ও রাঙামাটি ব্যাপ্টিস্ট চার্চ প্রায় ১ হাজার ৬৯০ উপজাতি পরিবারকে খ্রিস্টান পরিবারে পরিণত করেছে। এগুলো তুলনামূলকভাবে হাল আমলের হিসাব। পাহাড়ি যেসব জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই।

বাংলার বুকে একখণ্ড ইউরোপ

পাহাড়িদের সংস্কৃতি অটুট রাখার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনকারী পশ্চিমাগোষ্ঠীর মদদে ধর্মান্তরকরণে উপজাতিদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিপন্ন। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এভাবে স্পর্শকাতর এলাকায় ডেমোগ্রাফির নাটকীয় পরিবর্তন মেনে নেয়া যায় না। ব্রিটিশ রাজশক্তি পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিল, যাতে পরস্পরে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মিশনারিরা চন্দ্রঘোনা, মালুমঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে খ্রিস্টধর্ম ও তাদের সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে। বাংলাদেশে কর্মতৎপর এনজিওর সংখ্যা ৩০ হাজার। বহুজাতিক কোম্পানির আর্তরাজনৈতিক স্বার্থে এবং অসহায়, নিঃস্ব, নিরক্ষর মানুষকে সেবা করার আড়ালে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার তৎপরতায় বহু এনজিও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এদের বাজেটের ৯০ শতাংশ অর্থ খ্রিস্টানদের বা খ্রিস্টান হওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের স্বার্থে, নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিদেশি কনসালটেন্টের পেছনে ব্যয় হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সাজেক ইউনিয়নটি সীমান্তবর্তী ও দুর্গম, যা বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলার সমান। নৈসর্গিক সৌন্দর্যম-িত এই উপত্যকায় পৌঁছতে খাগড়াছড়ি বা রাঙামাটি শহর থেকে দুদিন লাগে। এই ইউনিয়নের বিশটি গ্রামে খেয়াং, বম, পাংখু, লুসাই উপজাতির ১০ হাজার মানুষের বাস। ২০ বছর আগেও এখানে খ্রিস্টধর্মের নামগন্ধ ছিল না। উপজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি সবই ছিল। আজ তার কিছুই নেই। শুধু ইংরেজিতে কথা বলাই নয়, সেখানকার অধিবাসীরা গিটার বাজিয়ে ইংরেজি গান করে। মেয়েরা পরে প্যান্ট-শার্ট স্কার্ট। তাদের

দেখে মনে হয় 'বাংলার বুকে একখ- ইউরোপ'। কারণ এখন তারা সবাই খ্রিস্টান। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় খ্রিস্টানরা অনেক কৌশল ও টাকা ব্যয়ে ধর্মান্তরিত করে চলেছে। পাংখু উপজাতি পুরোপুরি খ্রিস্টান হয়ে গেছে। বদলে গেছে তাদের ভাষা, এমনকি বর্ণও ইংরেজি। এনজিওর নাম ধারণ করে খ্রিস্টানরা এই দুর্গম এলাকায় হাসপাতাল, বিনোদনকেন্দ্র, গির্জা ইত্যাদি গড়ে তুলেছে।

বাইবেল ও গির্জা

বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির অরণ্যে বসবাসরত চাকমা, মারমা, মুরুং, টিপরা, খাসিয়া, মনিপুরী, লুসাই, মগ, গারো প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে খ্রিস্টসংস্কৃতি ও ধর্মের অনুপ্রবেশ জীবনধারায় এনেছে আমূল পরিবর্তন। 'প্রতিটি মানুষের জন্য একটি বাইবেল এবং প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গির্জা' এ স্লোগানকে সামনে রেখে তারা লক্ষ্যপানে ছুটে চলেছে। ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশে খ্রিস্টান ছিল ৫০ হাজার। ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে, ২০১২ সালে দাঁড়ানোর কথা এক কোটিতে। ১৮৮১ সনে বাংলাদেশে প্রতি ৬০০০ মানুষে একজন খ্রিস্টান ছিল। ১৯০১ সালে ১০০০ মানুষে একজন, ১৯৮২ সালে ৩২৬ জনে একজন, ১৯৯০ সালে ২৯ জনে একজন, ১৯৯২ সালে ২২ জনে একজন, ২০০০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১১ জনে একজন। ২০১৫তে তাদের লক্ষ্য হলো প্রতি ৩ জনে একজন।

সেভেন সিস্টার নামে খ্যাত মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, হিমাচল, অরুণাচল প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। ওইসব পাহাড়ি অঞ্চলসংলগ্ন বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় উল্লেখযোগ্য হারে খ্রিস্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ ইঙ্গিত দিচ্ছে, খ্রিস্টান অধ্যুষিত ইউরোপীয় দাতাগোষ্ঠী ও এনজিওরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে টার্গেট করে এগোচ্ছে। প্রায় দুবছর স্থগিত থাকার পর ইউএনডিপি এই বছর রাঙামাটি, বিলাইছড়ি, বান্দরবান ও থানচিতে ২০ লাখ মার্কিন ডলারের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা উন্নয়নের নামে দেদারসে বৈদশিক অর্থের দ্বারা নবদীক্ষিত খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের কাজে লিপ্ত।

যেভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়

ধর্মান্তরিতকরণে তাদের পলিসি বড়ই ন্যাক্কারজনক। ১৯৬৫ সালে কক্সবাজার জেলায় মালুমঘাটে মিশনারিরা খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপন করে। সে সময়কার সরকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মিশনারি কাজে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রধান উৎ. ঠরমড় ই. অষংবহ এ কথায় কর্ণপাত না করে মিশনারি কাজ চালাতে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তাদের কার্যক্রম আরো বাড়িয়ে দেয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক রিপোর্টে বলা হয়, এই হাসপাতাল ১০ হাজার যুবককে (শিশু ও পোষ্যসহ মোট ৪০ হাজার) খ্রিস্টান বানিয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব নব্যখ্রিস্টানদের চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন করা হয়। দৈনিক ইনকিলাব মার্চ ১৩, ১৯৯৩

স্থানীয় লোকদের বাধা ও সমালোচনা এড়ানোর জন্য নব্যখ্রিস্টানদের এভাবে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মালুমঘাট হাসপাতালে যে জঘন্য উপায়ে অসহায় জনগণকে খ্রিস্টান বানানো হয়, তার বিবরণ নিম্নরূপ।

১. প্রথমে রোগীকে খুব নিম্নমানের অষুধ দিয়ে মুহাম্মদের নাম নিয়ে খেতে বলা হয় (হিন্দুদের ক্ষেত্রে রামকৃঞ্চের নাম)। এতে যখন রোগ নিরাময় না হয়, তখন উচ্চমানের অষুধ দিয়ে মূর্খরোগীদের যিশুর নামে অষুধ খেতে বলা হয়। সঠিক অষুধ সেবনের ফলে রোগ যখন ভালো হয়ে যায়, তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়, যিশুই তাকে রোগমুক্তি দান করেছেন।

২. যিশু যেহেতু রোগমুক্তি দান করেছেন, সেহেতু তিনিই তোমাদের বেহেশত দিতে সক্ষম, কাজেই তার ওপর বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক তার ধর্মকেও গ্রহণ করো।

৩. মুহাম্মদ খুব দুর্ভাগা এবং তার অনুসারীরাও খুব গরিব। ধনী হতে চাইলে খ্রিস্টান হও, যিশু তোমাকে ধনী বানিয়ে দিবে।

৪. 'মরণে নেহি ভয়' বইয়ে বলা হয়েছে, বাইবেলের তুলনায় কুরআন অতি নিকৃষ্ট। মুহাম্মদের শিক্ষায় জীবনের জন্য কিছুই নেই। তার অনুসারীরা চোর, বাটপার ও বদমায়েশ।

৫. তারা নার্স, বাগান পরিচর্যাকারী প্রভৃতি লোকদের খ্রিস্টান হওয়ার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করে। অনিচ্ছুক লোকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

৬. নগদ টাকা, ফ্রি অষুধ, চাকরি প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে তারা খ্রিস্টান বানায়।

মাওলানা রহিমুল্লাহ, বান্দরবানের স্থানীয় বাসিন্দা ও একটি মসজিদের ইমাম। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ধর্মান্তর করা হয় কীভাবে? তিনি জানালেন, পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন মিশনারি দল পাঠিয়ে, বইপত্র, আর্টিকেল ছাপিয়ে যেগুলো ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ ছড়ায়, ইসলামকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে হেয়-প্রতিপন্ন করে, চিকিৎসা, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে), নাস্তিকতা ছড়ানো এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করা হয়। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন এভাবে, আমার এক সাথী রফিক, প্রাইমারিতে একসাথে পড়েছি। এরপর সে খ্রিস্টান মিশনারিদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়। ৫-৬ বছর পর তার সাথে দেখা, তখন জানলাম, তার নাম এখন হোয়াইট| অর্থাৎ সে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। এভাবে আমাদের বাড়ির এক রাখাল ছিল মারমা। সে খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি হাসপাতালে সেবক হিসেবে যোগ দেয়। ২-৩ বছর পর দেখি, সেও খ্রিস্টান হয়ে গেছে। এভাবে অনেক মুসলমান এবং উপজাতি খ্রিস্টানদের প্ররোচনায় পড়ে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো জানান, আমার এক বন্ধু মিজান, সে চাকমা থেকে মুসলমান হয়ে গেলে তার ওপর এনজিওরা পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে যায় এবং তাকে অনেক হুমকি ধমকি দেয়। শেষপর্যন্ত সে ওই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

উত্তরণ কোন পথে?

আফসোসের সাথে বলতে হয়, এনজিওরা যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে ধর্মান্তকরণের কাজ চালাচ্ছে, বিভিন্ন সেবার আড়ালে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার চালাচ্ছে, সে হিসেবে বলতে গেলে মুসলিম এনজিও একেবারে পিছিয়ে। সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে তারা এসে যদি আদিবাসীদের মাঝে খ্রিস্টানধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করতে পারে, তাহলে এত কাছের হয়েও আমরা মুসলমানরা কেন ইসলামধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার না করে বসে আছেÑ এমন প্রশ্ন অনেকের মনেই। প্রায় ২২বছর পূর্বে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রামের সাবেক প্রধান পরিচালক আলহাজ মাওলানা ইউনুছ রহ. কাপ্তাইয়ের অদূরে সুখবিলাস ও বান্দরবান সদরে দুটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক দাতব্য হাসপাতাল ও বিভিন্ন ইসলামি মিশনারি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা প্রদানের সূচনা করেছিলেন, তা যথেষ্ট ফল দিয়েছে। ভারতের প্রসিদ্ধ আলেম সাইয়েদ আসআদ মাদানি রহ. ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশের আলেমদের খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মিশনারির কর্মকা- সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক ড. আফম খালেদ হোসেন বলেন, আসলে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণেই পার্বত্য অঞ্চলে ধর্মান্তকরণ আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা বিভিন্ন উপজাতিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করছে। সেবার আড়ালে তারা ধর্মপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। এ জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। এ অঞ্চলে মুসলমানদের কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে হাসপাতাল, বিভিন্ন সেবামূলক মিশনারি গড়ে তোলার মাধ্যমে সেই ভয়ঙ্কর করাল থাবাকে থামাতে হবে, যা দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো এদেশের শিকড়ে আঁচড় দিতে চায়।
দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাওয়াতের কাজ করে আসছেন ইসালামিক দাওয়াহ ইনসটিটিউটের পরিচালক মাওলানা যোবায়ের। তার কাছে পার্বত্য অঞ্চলে কাজের অভিজ্ঞতা
সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আসলে খ্রিস্টানরা বিভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাদের মিশনারি কর্মকা- চালিয়ে যায়। যেমন খ্রিস্টধর্মালম্বীদের ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখা, মুসলিমদের ইসলামের গ-ি থেকে বের করে আনা, ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে সন্দেহর সৃষ্টি করা, মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করা, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বৃহদাংশে খ্রিস্টান বানানো, তাদের সেখানে অনুপ্রবেশ করানো, ইসলামের শিক্ষা দীক্ষার চেয়ে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা দীক্ষাকে প্রিয় করে তোলা এবং পশ্চিমের উন্নতি খ্রিস্টধর্মের কল্যাণেইÑ এ ধারণা বদ্ধমূল করা ইত্যাদি। তাদের ধর্ম ভ্রান্ত এবং অসার হওয়া সত্ত্বেও তারা কত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাদের ধর্ম প্রচার-প্রসারে কাজ করে, সে তুলনায় আমরা একেবারে পিছিয়ে। আমাদের স্বতন্ত্র কোনো দাওয়াতের গ্রুপ নেই, অর্থকড়ি নেই, অথচ খ্রিস্টানদের হাজার হাজার ধর্মজাযক বিশ্বের নানা প্রান্তে খ্রিস্টধর্মের প্রচারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই সংকট কাটিয়ে উঠতে মাওলানা যোবায়ের ওইসব অঞ্চলে দাওয়াতের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের স্বরূপ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। দলমত নির্বিশেষে পাহাড়ি অঞ্চলে কাজ করতে উদ্যোগী করতে হবে।

কাপ্তাইয়ের অদূরে সুখবিলাসে হজরত হাজী ইউনুস রহ. প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক মিশনারি সেন্টারে (মারকাযুদ দাওয়াতুল ইসলামিয়া) দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন মাওলানা নাসিরুদ্দিন। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বাঙালি উপজাতিরা কেমন আছেন? তিনি বললেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের আমলে মোটামুটি ভাল ছিল। তবে বর্তমান মহাজোট সরকার আসার পর বাঙালিদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে একটি টিকেটের প্রয়োজন, যাতে দিতে হয় অনেক ট্যাক্স।

সুখবিলাস হাসপাতালের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাসপাতাল আর মিশনারি একই সাথে আছে। হাসপাতালের নাম শারজাহ হাসপাতাল-২ (শারজাহ হাসপাতাল-১ এর অবস্থান সম্ভবত সোমালিয়ায়)। এই হাসপাতালে আউটডোর এবং ইনডোর উভয় বিভাগ রয়েছে। আউটডোরে সাধারণ ও জটিল রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসার পর ফ্রি অষুধপত্র দেয়া হয়। ইনডোরে পুরুষ ও মহিলা বেড উভয়টি রয়েছে। পুরুষদের জন্য ১২ বেড ও মহিলাদের জন্য ১২ বেড, সর্বমোট ২৪ বেড রয়েছে। এখানেও সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা দেয়া হয়। সামগ্রিকভাবে শীতকালে রোগীর সংখ্যা কম থাকে এবং গ্রীষ্মকালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন প্রায় ৭০-৮০ জন রোগী এখানে চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। নিয়মিত ৪ জন ডাক্তার এখানে সেবা প্রদান করেন। শারজাহ হাসপাতাল থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রঘোনায় খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি হাসপাতাল রয়েছে। সেখানকার সেবা অবশ্যই আমাদের চেয়ে উন্নত। আমরাও চেষ্টা করি সর্বোচ্চ সেবা দিতে। ফ্রি সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে আয়ের উৎস কোথায়? জানতে চাইলে তিনি বলেন, নাম থেকেই অনুধাবন করা যায়, এটি আরব আমিরাতের দানশীল ভাইদের অর্থে পরিচালিত। আপনাদের মিশনারি সেন্টার কেমন চলছে? জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে জামাতে পাঞ্জুম পর্যন্ত (৫ম শ্রেণি) মাদরাসা আর ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হয়। আরো বিভিন্ন মকতব প্রতিষ্ঠা এবং সেবামূলক কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, যেগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে ইনশাআল্লাহ!

ধর্মান্তর, খ্রিস্টান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য ভয়াবহ পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনসাধারণের বিশেষ করে মুসলমানদের দাওয়াতি ও সেবার ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে বাস্তব কর্মসূচি হাতে নেয়ার তাগিদ দেন পার্বত্য অঞ্চল বিশ্লেষকরা। [*রিপোর্ট করেছেন, আমাদের একজন দ্বীনি ভাই]*

www.jundullahsite.wordpress.com

www.jundullahsite2.blogspot.com